কলঙ্কিনীর খাল

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

আড়াই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীসুশীলরঞ্জন জানা-কে

কলঙ্কিনীর খাল

এপারে শিখিপুচ্ছ—ওপারে বনপলাশী—মাঝ দিয়া বহিয়া গেছে কলঙ্কিনীর খাল।

বর্ষার আগমনে খালের রূপ বাড়িয়াছে, দুই পাড়ে সে যেন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে—সুরূপা ষোড়শীর হাসির মতই সে হাসি যেন কল্ কল্ করিতেছে অন্তরের ঐশ্বর্য্যে, এখনই যেন সে কৌতুকে খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কিন্তু গরবিনী কলঙ্কিনীর ভারি আজ গরব বাড়িয়াছে, ভরা-রূপের ভারে আজ থম্ থম্ করিতেছে। অন্তরে তাহার রূপের চেতনা জাগিয়াছে, বাহিরে সেই রূপ-চৈতন্য চমৎকার বান ডাকাইয়াছে।

বনপলাশীর ভৈরব দত্তের ছেলে সুন্দর অপরাহ্নে তাহাদের বাড়ীর পিছুকার আমবাগানের পথ দিয়া ঘাটে আসিয়া নির্নিমেষ নয়নে সেই কলঙ্কিনীর খালের রূপ দেখিতে লাগিল। বিস্ময় ও পরিতৃপ্তি যেন তাহার দুই চোখ ভরিয়া তুলিল। খালের ঘাটে তাহাদের বাড়ীর নৌকাটি পাড়ের একটি গাছের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধা ছিল। সুন্দর ভাবিতেছিল, নৌকা লইয়া সে একবার খালে খালে একটু ঘুরিয়া আসিবে কি-না। এমন সময় তাহার নজরে পড়িল, ওপারে নিশি সজ্জনের বাড়ীর ঘাটের উঁচু পাড়ে ঠিক একটা বাতাবি লেবুর গাছের নীচে কে যেন চোখে কাপড় চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তেই সে চিনিল, এ সেই নিশি সজ্জনের প্রথম পক্ষের মেয়ে টিয়া। টিয়াকে সুন্দর এযাবৎ এই ঘাটেই বহুদিন বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে

দেখিয়াছে ; কিন্তু কোন দিনই সে ভাল করিয়া টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। তবে লোকের মুখে সুন্দর টিয়ার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছে ; আরও শুনিয়াছে, মা-মরা মেয়ে টিয়াকে নাকি নিশি সজ্জনের দ্বিতীয় পক্ষ রূপসীর হাতে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে দিবারাত্র লাঞ্ছিত হইতে হয়। টিয়ার প্রতি তাই তাহার নিজ মনের অগোচরে কেমন যেন একটু সহানুভূতি ছিল ; কিন্তু টিয়ার পূর্ব্বপুরুষ—অর্থাৎ শিখিপুচ্ছ গাঁয়ের সজ্জন-বংশ যে বনপলাশীর দত্তবংশের চিরশত্রু তাহাও সুন্দরের অবিদিত ছিল না ; কাজেই সুন্দরের সে সহানুভূতি কোন দিনই তেমন মাথা তুলিতে পারে নাই। আজ সুন্দর জীবনে এই প্রথম টিয়ার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি ফেলিয়া তাকাইল, অবশ্য এতদিনে এই প্রথম অসঙ্কোচে তাকাইবার সুযোগও সে পাইয়াছিল—যেহেতু টিয়ার চোখ তাহার কাপড়ের আঁচল দিয়া চাপিয়া ধরা ছিল। টিয়া একবার ক্ষণিকের জন্য মুখের উপর হইতে কাপড়ের আঁচল সরাইয়া লইল, সুন্দর সেই সুযোগে টিয়ার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। টিয়া কাঁদিতেছে। সুন্দরের অমনি মনে হইল, হয় ত টিয়ার সৎ-মা রূপসী আজ তাহাকে গঞ্জনা দিয়াছে, তাই হয় ত সে ঘাটে কাজের অছিলায় আসিয়া কাঁদিতেছে। টিয়ার ত তবে বড় দুঃখের জীবন! সুন্দরের মনে আজ টিয়ার জন্য বড় ভাবনা ধরিয়া গেল। টিয়ার জন্য সে সত্যই ব্যথিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আবার দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপায় দুঃখবোধ তাহার তরল হইয়া আসিল। সুন্দর তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠিয়া আমবাগানের দিকে চলিয়া গেল। অল্প পরেই সে একটা ছাতির শিক্ ও হাতে চার-পাঁচটি পিটুলি ফল কোথা হইতে যেন সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। টিয়া তখনও পূর্ব্ববৎ চোখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতেছিল। সুন্দর ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভাবিল, তারপরে মুখে দুষ্ট হাসি খেলাইয়া শিকের মাথায় একটা পিটুলি গাঁথিয়া শিকের অপর মাথা ধরিয়া টিয়ার কপাল লক্ষ্য

করিয়াই শিকটাকে শূন্যে দোলাইয়া ঝাঁকি দিয়া পিটুলি ফলটা ছুঁড়িয়া মারিল অতি ভয়ে ভয়ে—যাহাতে ফলটা গিয়া টিয়ার কপালে লাগিলেও খুব জোরে না লাগে। কিন্তু ফলটা ওপারের ঘাটের অতি কাছে জলের উপর গিয়া পড়িয়া একটা টুপ্ করিয়া আস্তে শব্দ করিল। টিয়া তাহা টেরও পাইল না। সুন্দর শিকে ফুঁড়িয়া আবার একটা পিটুলি ফল ছুঁড়িল। এবারও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। ইহাতে সুন্দরের কেমন জিদ্ চাপিয়া গেল, সে আবার ছুঁড়িল।

এবার ঠিক টিয়ার কপালে গিয়াই তাহা লাগিল এবং একটু জোরেই লাগিল, অথচ সুন্দর কিন্তু অত জোরে তাহা লাগাইতে চায় নাই। টিয়া মুহূর্ত্তে চোখের উপর হইতে কাপড়ের আঁচল সরাইয়া লইয়া কপালে হাত তুলিয়া দিয়া বলিল, উঃ!

তারপরেই টিয়া সম্মুখে অপর পারের ঘাটের পানে দৃষ্টি ফেলিতেই দেখিতে পাইল, সুন্দর সেখানে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে, আর তাহার হাতের শিকের মাথায় আর একটা পিটুলি ফল গাঁথা রহিয়াছে। টিয়া সকলই তখন বুঝিতে পারিল এবং লজ্জায় সে যেন একেবারে মরিয়া গেল। তাহার গোপন কান্না ত তবে বুঝি আর গোপন রহিল না, সুন্দর ত সকলই আজ দেখিয়া ফেলিয়াছে, জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু সেখানেও সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, হঠাৎ ছুটিয়া সে বাড়ীর দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুন্দর যত জোরে সম্ভব হাসিয়া পলায়নতৎপর টিয়াকে যেন অপ্রতিভ করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইল।

টিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে পর সুন্দরের চোখে নিজের বোকামি ধরা [illegible] প্রথম সুন্দরের মনে হইল, টিয়া যে দেখিতে সুন্দর [illegible] করিবার আর কিছু নাই; কিন্তু কি দুর্ব্বুদ্ধিতে যে টিয়াকে [illegible] করিয়া আরও কিছুক্ষণের জন্য এমন সুযোগ সত্ত্বেও [illegible] লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল তাহা সে এখন আর ভাবিয়া

পাইতেছিল না। আর তাহার এই অকারণ দুর্ব্ব্যবহারে টিয়া না জানি কত ক্ষুণ্ণই হইয়াছে, হয় ত জীবনে কোন দিনই টিয়া তাহার এই দুর্ব্ব্যবহার আর ভুলিতে পারিবে না। সত্যই একাজটা যে তাহার পক্ষে কত বড় ছেলেমানুষি হইয়া গিয়াছে তাহা সে এখন অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিতে-ছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, নৌকায় উঠিয়া ওপারে গিয়া নিশি সজ্জনের বাড়ী হইতে টিয়াকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া ইহারই জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চায়—কিন্তু বংশ-পরম্পরায় যে শত্রুতা এই দুই পারের দুই বাড়ীতে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহারই গ্লানি কেমন করিয়া যেন মুহূর্ত্তে মাথা তুলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা হইয়া দাঁড়াইল। তারপরে সমস্ত ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়া সুন্দর হাতের পিটুলি ফল গাঁথা ছাতির শিকটা খালের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ করেচি! আমার খুশী, আমি পিটুলি ফল ছুঁড়ে ওকে মেরেচি। কেন ও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদবে শুনি? মানুষের কান্না আমার দু'চক্ষের বিষ! ও আমি কিছুতেই দেখতে পারি না।···

টিয়ার কান্না সহসা থামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুন্দরের এই অপ্রত্যাশিত আচরণের অর্থ সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ঘাটের পথ ধরিয়া বাগানের ভিতর দিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন সে সুন্দরের কথা ভাবিতে ভাবিতেই ফিরিল। সুন্দরকে সে ইতিপূর্ব্বে ঘাটেই বহুবার দেখিয়াছে, কখনও আবার হয় ত খালের জলে সাঁত-রাইতেও দেখিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই এযাবৎ সে সুন্দরের সঙ্গে একটা কথা কহে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই। কাজেই সুন্দরের দিক হইতে আজিকার এই আচরণ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত। প্রথম তাই সে সুন্দরের প্রতি কেমন যেন রুষ্ট হইল, পরে একটু একটু করিয়া সকল দিক ভাবিয়া দেখায় সে বুঝিল যে, সুন্দরের এ আচরণ সত্যই

হাস্যকর! কাজেই সুন্দরের প্রতি কিছুমাত্র রাগ বা বিদ্বেষ আর সে পোষণ করিতে পারিল না। শুধু কপালের উপর হাত বুলাইয়া সে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে মৃদু হাসিল। কিন্তু বাড়ীর উঠানে পদার্পণ করিতেই টিয়ার অন্তরের হাসি ও কৌতুকবোধ মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং অতি-নিকট ভবিষ্যতে পিতার শাসনের জন্য সে নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। কারণ, উঠানে পা দিয়াই সে দেখিল যে, তাহার সৎ-মা রূপসী পশ্চিমের ঘরের দাওয়ার উপর অভিমানে ফাটিয়া পড়িয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিশি সজ্জনের কাছে বলিয়া চলিয়াছে—না বাপু, এখানে আর আমি একদণ্ডও থাকতে পারব না, তার চেয়ে তুমি আমাকে বাপের বাড়ী রেখে এসো। এই অতটুকু মেয়ে—না হয় গর্ভেই ধরিনি—তা ব'লে এমন ক'রে মুখের ওপর যা-তা অপমান ক'রে যাবে? কেন, কিসের জন্যে আমি সে অপমান মুখ বুজে সইব শুনি?

নিশি সজ্জন ইহাতে বিশেষ বিব্রত হইয়া বলিল, হুঁ, অপমান যে তোমার হয়েচে সে ত অনেকক্ষণ বুঝেচি; কিন্তু কেন টিয়া তোমাকে অপমান করতে গেল, কি হয়েছিল, তাই বল না?

রূপসী ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, থাক্, সে আর ব'লে কাজ কি! বড়র মেয়ে যখন টিয়া, তখন ত তার দোষ তোমার চোখে পড়বে না, কাজেই ব'লেও কিছু লাভ নেই।

নিশি সজ্জন বলিল, হ'লই বা সে বড়র মেয়ে, কিন্তু তাই ব'লে সে যদি অন্যায়ভাবে তোমার অপমান করে ত শাসন তাকে আমার করতে হবে বই কি!

রূপসী তখন বলিল, আমার অপরাধ—টিয়াকে আমি আমার এঁটো বাসনগুলো ঘাট থেকে ধুয়ে নিয়ে আসতে বলেছিলাম, কেন না, দুপুরবেলা খেয়ে উঠলেই ঘুমে আমার চোখ ভরে আসে। আর একথা কেই বা না

জানে যে, এ আমার বহুকালের অভ্যাস। টিয়া তার উত্তরে মুখ ঘুরিয়ে চ'লে গেল এমনভাবে—যে বাড়ীর দাস-দাসীকেও মানুষ অমন হেনস্থা করতে পারে না কিছুতে।

তারপর কণ্ঠ আরও করুণ করিয়া রূপসী বলিল, আমার মেয়ে করবে আমার অপমান! হায়! এতও আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল!

টিয়া এসব শুনিয়া একেবারে কাঠ মারিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। নিশি সজ্জন বা রূপসী কেহই তখনও টিয়ার আগমন টের পায় নাই।

নিশি সজ্জন সহসা চীৎকার করিয়া ডাকিল, টিয়া! টিয়া! অ টিয়া!

টিয়া মাথা নীচু করিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল! এমন তাহাকে প্রায়ই দাঁড়াইতে হয়।

নিশি সজ্জন গম্ভীর কণ্ঠে টিয়াকে প্রশ্ন করিল, টিয়া, তোর ছোটমা যা বলে তা সব সত্যি তা হ'লে?

রূপসী এমন সময় চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ও মাগো! তবে কি আমি মেয়ের নামে মিথ্যে বানিয়ে নালিশ করতে গেলাম নাকি? এও আমাকে শুনতে হ'ল!

টিয়া অতি সংযতকণ্ঠেই বলিল, না, ছোটমা মিথ্যে বলবেন কেন।

নিশি সজ্জন সহসা রূঢ় হইয়া বলিল, এরকম রোজ রোজ তোর নামে যদি আমাকে নালিশ শুনতে হয় ত সে বড় ভাল কথা না। আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে, তার এটুকু বুদ্ধিও ত থাকা উচিত। নিজের মা না হ'লেও মা ত—তার সঙ্গে রোজ ঠোকাঠুকি হওয়া আমি পছন্দ করিনে। এখন থেকে সাবধান হ'য়ে চলতে শেখো বলচি।

টিয়া অতি ভয়ে ভয়ে আবার বলিল, আমার তখন হাতে আর একটা কাজ ছিল—তাই ছোটমা'র কাজ করতে একটু দেরী হ'য়ে গিচলো, এই যা, নইলে সে বাসন ত আমিই ধুয়ে এনেচি।

রূপসী সঙ্গে সঙ্গে অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, বা, বেশ বানিয়ে কথা বলতে শিখেচিস্ ত টিয়া। বলি, মুখ ঝামটা দিয়ে তখন ব'লে যাস্‌নি যে, রোজ রোজ আমি বাসন মাজতে পারব না ?

টিয়া তখন বলিল, কে তবে তোমার এঁটো বাসন আজ ধুয়ে-মেজে এনে দিলে শুনি ?

রূপসী ব্যঙ্গ-কঠিন-কণ্ঠে উত্তরে বলিল, আহা! আমাকে কেতাথ' করেচো একেবারে! না ধুয়ে দিলেই পারতিস্! আমার যেন আর ছরথ নেই! বলি, সতীনের মেয়ে ঘরে না থাকলে আমার আর এঁটো বাসন মাজা হ'ত না! ম'রে যাই মেয়ের ঠেস্ দে'য়া কথা শুনে।

টিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, নিশি সজ্জন সহসা তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, আর একটা কথাও এ নিয়ে চলবে না। ছোট-মা'র সঙ্গে না বনে ত মামার বাড়ী গিয়ে থাক'। কিন্তু এখানে থেকে অষ্টপ্রহর দু'জনে পান থেকে চূণ খসা নিয়ে যে প্রলয় বাধাবে—সে হবে না।

ও মাগো!—দু'জনে আমরা প্রলয় বাধাচ্ছি! একথাও আমাকে শুনতে হ'ল!—বলিয়া রূপসী সহসা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া সরব কান্না জুড়িয়া দিল।

নিশি সজ্জন মহা বিপদে পড়িয়া কি যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, ফের্ যদি কোন দিন আবার ছোটমা'র সঙ্গে তোর ঝগড়া বাধে টিয়া, ত সেই দিনই আমি তোকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো জানবি।

বলিয়া নিশি সজ্জন সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিতেই উঠানের একপাশে মনোহরকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

মনোহর এক মুখ হাসি লইয়া বলিল, দিদি কোথায় জামাইবাবু? ঐ দাঁড়িয়ে বুঝি টিয়া কাঁদচে? কেন, ওর আবার এত দুঃখু কিসের? আপনি বুঝি কিছু বলেচেন তবে ওকে?

টিয়া সত্যই কাঁদিতেছিল।

দু-দশ গাঁয়ের মধ্যে শিখিপুচ্ছের নিশি সজ্জনের বেশ নাম-ডাক আছে। এককালে সজ্জন-বংশের প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা হাটে-ঘাটে সর্ব্বত্র আলোচিত হইত, এখন আর তেমনটি না হইলেও নিশি সজ্জনকে অনেকেই বেশ সমীহ করিয়া চলে এবং ভয়ও করে। নিশি সজ্জনের অবস্থা বেশ ভালই বলিতে হয়, শরীরে তাহার অসীম শক্তি, সাহস তাহার দুর্জ্জয়, কিন্তু সমস্ত কিছু সত্ত্বেও নিশি সজ্জন রূপসীর কাছে কেমন যেন একটু ছোট হইয়া আছে। ইহার কারণটা অবশ্য কোন দিনই সে ভাবিয়া দেখে নাই, কিন্তু বেশী সময়ই সে যেন অন্যায় করিতেছে জানিয়াও রূপসীর আব্দার-শাসন-খেয়াল সমস্তই অবিচারে মানিয়া লইতেছে। না মানিয়া লইয়া যেন তাহার আর উপায় নাই—কাজেই। রূপসীর মাত্রাজ্ঞানহীন খেয়ালের প্রশ্রয় দিতে গিয়া কতদিনই যে সে টিয়ার উপর অযথা অন্যায় আচরণ করিয়াছে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে—তাহার আর হিসাব নাই। রূপসীর মনস্তুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে নিশি সজ্জনকে এমন সব কাজ করিয়া বসিতে হয় যে পরে তাহারই জন্য অন্তর তাহার অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

টিয়ার উপর আজিকার ব্যবহারও যে তাহার নিতান্ত নিন্দনীয় হইয়াছে তাহাতে তাহার নিজেরও আর সন্দেহ ছিল না এবং মনোহরের আগমনে সেই কথাটাই তাহার মনে বারবার জাগিতেছিল। আর রূপসীর বুদ্ধি-শুদ্ধির উপরে নিশি সজ্জনের কেমন যেন একটা অনাস্থা আসিয়া গিয়াছিল। কাজেই রূপসী পাছে মনোহরের আগমনে আরও বেসামাল হইয়া ওঠে সেই ভয়েই নিশি সজ্জন কোনও রকমে আত্মীয়তা বজায় রাখার মত দু-একটা কথা—যাহা নিতান্ত না বলিলেই নয়—বলিয়া কাজের অছিলায় বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল।

নিশি সজ্জন চলিয়া গেলে মনোহর বরাবর উঠানের অপরপ্রান্তে—

যেখানে দাঁড়াইয়া টিয়া চোখের জল কাপড়ের আঁচল দিয়া মুছিতেছিল সেখানে আগাইয়া গিয়া টিয়ার অতি কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে—টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল! বলি, কপাল তোমার ফুলল কেমন ক'রে? কেঁদে কেঁদে ত মানুষের চোখই ফোলে জানতাম।

টিয়া মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিতে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইল না।

ওদিকে রূপসীও নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠানে নামিয়া আসিল এবং পূর্ব্বমুহূর্ত্তের কান্নার কোনও আভাস কণ্ঠে প্রকাশ পাইতে না দিয়া মনোহরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হ্যাঁ মনোহর, বলি, শিখিপুচ্ছে কি আসা হয় দিদির সঙ্গে দেখা করতে, না তার সতীনের মেয়েটির সঙ্গে?

মনোহর ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না, কারণ অপ্রতিভ হইতে সে কোন অবস্থাতেই জানে না। আর রূপসীর কথা সে কোন দিনই বড়-একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না; যেহেতু রূপসীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে সে সচেতন, আর রূপসীর সঙ্গে তাহার বয়সের পার্থক্যও খুব সামান্য এবং সর্ব্বোপরি রূপসী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্যে আনিবার মত দুর্ব্বল মনোবৃত্তি তাহার নাই বলিয়াই সে মনে করে।

মনোহর অতি সহজকণ্ঠেই তাই তাহার দিদির অভিযোগের উত্তরে বলিল, না দিদি, আমাকে তেমন স্বার্থপর তা ব'লে ভেবো না—যে আসব শুধু আপনার দিদিটির সঙ্গে দেখা করতে। আসি আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গেই দেখা করতে। আর তা না করলে পর দশজনেই বা ভাববে কি, আর বলবেই বা কি? লোকের কথা আমার বড় গায়ে লাগে। তাই সবার মন রেখে আমার কাজ। ত্রুটি কিছুতে হবার জো-টি নেই।

রূপসী মনোহরের কথায় ভারি বিপদে পড়িয়া গেল। ইহার পরে যে আর কি বলিয়া মনোহরকে আক্রমণ করা যাইতে পারে এবং টিয়াকে সেই সঙ্গে একটু আঘাত দেওয়া যায় তাহা সে আর ভাবিয়া পাইতেছিল না।

অগত্যা রূপসী মনোহরের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাতে টান দিয়া বলিল, আয়, আমার ঘরে গিয়ে বসবি চল্‌, তারপরে তোর মুখে বাড়ীর সব কথা শুনব।

টিয়া আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, আবার খালের ঘাটের দিকেই সে চলিয়া গেল। মনোহর দিদির সঙ্গে চলিতে চলিতে একবার পিছু ফিরিয়া বলিল, অ টিয়া, টিয়াপাখী, যেও না বল্‌ছি। গেচ' কি আমার মাথার দিব্যি! দিদির ঘরে এসো, গপ্‌পো করব তোমার সঙ্গে, —সেই সেবার নব-দুর্ব্বাদলে যাত্রা আমাদের জমল কেমন···সেই সব গপ্‌পো! পার্ট শুনতে চাও ত এন্‌তার পার্ট শোনাবো···মাইরি বল্‌ছি!

টিয়া কিন্তু মনোহরের কথা শুনিয়াও ফিরিল না। মনোহরকে তাহার কেন জানি ভাল লাগে না, মনোহরকে সে ভয়ের চক্ষে দেখে।

টিয়া যখন তাহাদের খালের ঘাটের উঁচু পাড়ের বাতাবিলেবুর গাছটার একটা হেলানো ডালের উপর বসিয়া মাটিতে পা রাখিয়া দত্তদের বাড়ীর ঘাটের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া রহিল—তখন বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার আর বড় বিলম্ব নাই। টিয়া তাহার কপালের ফুলা অংশটুকুতে বার বার হাত বুলাইয়া ভাবিতেছিল, আবার মনোহর আসিয়াছে। যে কয়দিন মনোহর এখানে থাকিবে সে কয়দিন তাহার দুর্ভাবনার আর অন্ত থাকিবে না।—মনোহরের কথা-বার্ত্তা চাল-চলন তাহার একেবারেই ভাল লাগে না। আরও বিশেষ করিয়া তাহার ভাল লাগে না মনোহরের গায়ে পড়িয়া আপনার লোক সাজিবার ভাবটি। এখানে যখন সে থাকে তখন অষ্টপ্রহর সে যেন টিয়ার সন্ধান করিয়া ফেরে, আজে-বাজে যত অকারণ কথা কহে, ভাব-ভঙ্গীতে বড় প্রিয়জন বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পায়, গৃহকর্ম্মে অহেতুক বাধা জন্মায়; ফলে তাহার দিদির চক্ষে টিয়াকে সে আরও বিষ করিয়া তোলে। টিয়া মনোহরকে একে-

বারেই দেখিতে পারে না। মনোহরের এখানে অবস্থানকালে কেবলই টিয়া কামনা করে, তাহার সত্বর বিদায় গ্রহণের এবং বিদায় গ্রহণ করিলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচে। তবে মনোহর এককালে বেশী দিনের জন্য এখানে থাকিতে পারে না; সে মহাকালের উমাপতি ঘটকের যাত্রা-পার্টিতে কাজ করে, পালা গাহিতে তাহাকে যাত্রা-পার্টির সঙ্গে সঙ্গে এ-গ্রামে সে-গ্রামে ছুটা-ছুটি করিতে হয় এবং ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সে সময় করিয়া শিখিপুচ্ছে দিদির বাড়ী ঘুরিয়া যায়। তাই দুই দিনের বেশী একযোগে সে দিদির বাড়ীতে কখনও বড় একটা থাকিতে চায় নাই।

টিয়া বসিয়া বসিয়া এই যে বিরক্তিকর মনোহর তাহারই কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু দৃষ্টি তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল আর একজনকে—যে খেলাচ্ছলে আজ পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহার কপাল ফুলাইয়া দিয়াছিল—সেই নিষ্ঠুর সুন্দরকেই। সুন্দরের আচরণের অসঙ্গতি আর তাহাকে এখন পীড়া দিতেছিল না। সুন্দরকে সে ত কত দিন কত ভাবে দেখিয়াছে, কিন্তু কোন দিনই তাহার সহিত কথার আদান-প্রদান হয় নাই, যেহেতু বংশানুক্রমে তাহারা পরস্পরের শত্রু। অথচ টিয়া বা সুন্দর কেহই কোন দিন স্বচক্ষে সে শত্রুতার নিদর্শন কিছু দেখে নাই। কোনও এককালে নাকি এই দুই বংশের শত্রুতার ফলে কলঙ্কিনীর খালের জলও লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে সব তাহাদের শোনা কথা—গল্প-কাহিনীর মতই মনে হইয়াছে। নিশি সজ্জন ও ভৈরব দত্তের আমলে কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এযাবৎকাল ঘটে নাই। আর না ঘটার জন্য যদি কেহ দায়ী হয় ত সে ভৈরব দত্ত। কারণ ভৈরব দত্তকে তাহার ধান-চালের কারবার দেখিতে বৎসরের মধ্যে বেশী সময়ই শহরে ব্যবসাস্থলে থাকিতে হয়। তাহার উপরে আবার সে একটু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা গোলমালের মধ্যে কিছুতেই থাকিতে চাহে না। নিশি সজ্জনের প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন-প্রকার। সে চাহে, একটা দাঙ্গা-

হাঙ্গামা উভয়পক্ষে বাধুক—সে একবার আপন শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিয়া বংশমর্য্যাদা কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিবে। কিন্তু এযাবৎ ভৈরব দত্ত তাহাকে সেরূপ কোনও সুযোগ দেয় নাই। এমন কি, ভৈরব দত্তের পূর্ব্বপুরুষেরা নিশি সজ্জনের পূর্ব্বপুরুষের সহিত দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবার নির্দ্দিষ্ট একটা স্থান লইয়া কলঙ্কিনীর খালে যে একটা বাৎসরিক দাঙ্গায় মাতিয়া উঠিত তাহাও এখন বন্ধ হইয়া গেছে। আর বন্ধও হইয়াছে ভৈরব দত্তেরই জন্য। ভৈরব দত্ত খালের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিমা ডুবানো লইয়া দাঙ্গা বাধাইতে রাজি হইতে পারে নাই এবং যে স্থান লইয়া এতকাল এত দাঙ্গা হইয়া গেছে সে স্থানে অনায়াসেই সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা বিনা বাধায় ডুবাইতে দিয়া নিজে তাহা হইতে কিছু-দূরে প্রতিমা ডুবাইবার আয়োজন প্রতি বৎসর করিয়া আসিতেছে। ভৈরব দত্তের এত সাবধানতা সত্বেও নিশি সজ্জন প্রতি বৎসরই দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন বৎসরই সে সফলকাম হইয়া উঠিতে পারে না।

টিয়া ক্রমে সুন্দরের কথাই ভাবিতে লাগিল। মনোহরের কথা সেই সঙ্গে তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। হইলই বা সুন্দর তাহার বংশ-পরম্পরায় শত্রু, তথাপি সুন্দরকে তাহার কেন জানি ক্রমেই ভাল লাগিতে লাগিল। শত্রুর তাহার অভাব কি! গৃহেই কি তাহার শত্রুর অভাব আছে যে সুন্দর শত্রু বলিয়া তাহার সহিত সে আলাপ করিতে পারিবে না! আর তাহা ছাড়াও সুন্দর নিজে ত তাহার শত্রু নয়, সে তাহার পূর্ব্বপুরুষের শত্রুর বংশধর মাত্র। না, যেমন করিয়াই হউক্ সে সুন্দরের সঙ্গে আলাপ করিবে। কিন্তু কি উপায়ে যে তাহা সম্ভব তাহা সে আর ভাবিয়া পাইতেছিল না।

টিয়ার চোখের সম্মুখ দিয়া খাল ধরিয়া বহু নৌকা চলিয়া গেল; সে কিন্তু যে নৌকাটি সন্ধান করিতেছিল সে নৌকাটিকে আর খাল ধরিয়া চলিতে দেখিতেছিল না—অর্থাৎ যে নৌকাটি তাহাদেরই ঘাটের অপর

পারের ঘাটে বাঁধা থাকে। সুন্দরদের ঘাটে তাহাদের নৌকা বাঁধা নাই দেখিয়াই সে ঠিক করিয়াছিল যে, সুন্দর নিশ্চয় নৌকা লইয়া বৈকালের দিকে খালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কি কোথাও কাজে গেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করিয়া ঘনাইবার পূর্ব্বেই খালের জলে টিয়া সহসা একখানি নৌকা দেখিতে পাইল—সে নৌকা বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর, আর নৌকায় দত্ত-বাড়ীর সুন্দর বৈঠা দিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া ছিল। টিয়ার অন্তর মুহূর্ত্তে উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াই লজ্জায় কেমন যেন জড় হইয়া গেল। টিয়া কোনও রকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া পলাইতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন দুই হাত দিয়া তাহার দুই চোখ চাপিয়া ধরিয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—

টিয়া পাখীর ঠোঁটটি লাল,
পায়ে ধরি, পেড়ো না গাল।

টিয়া কণ্ঠ শুনিয়াই একটা ঝট্‌কান দিয়া চোখ ছাড়াইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মুখের চেহারা তাহার মুহূর্ত্তে কেমন যেন ভয়চকিত হইয়া উঠিল।

মনোহর একটু হাসিয়া বলিল, আমি কি সাপ, না বাঘ—যে একেবারে আঁৎকে উঠলে টিয়া ?

টিয়া তাহাতেও কথা কহিল না। ক্রোধে সে শুধু নীচেকার ঠোঁট দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

মনোহর পথের মাঝে ভাল করিয়া নামিয়া টিয়ার গৃহে ফেরার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া খুব একচোট হাসিয়া লইয়া বলিল, আমি যাত্রার দলের ছেলে ব'লে তুমি আমাকে দেখতে পার' না টিয়া, তাই নয় কি ?

টিয়া এইবার কথা কহিল, বলিল, না, তা মোটেই নয়। তোমার স্বভাব আমার ভাল লাগে না ব'লেই তোমাকে আমি দেখতে পারি না। কেন তুমি এখানে আসতে গেলে আমাকে বিরক্ত করবার জন্যে শুনি ?

এমন সময় ওপারের ঘাটে নৌকার শিকলটা যেন অর্থযুক্ত ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল।

মনোহর তাড়াতাড়ি বলিল, ও, আমি এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি টিয়া; আমারই অন্যায় হ'য়ে গেচে। ওপারের নাও যে আজকাল এ-ঘাটে এসে লাগচে তা আমি জানতাম না। আচ্ছা, এই আমি চ'লে যাচ্ছি।

পরদিন ভোরে উঠিযাই মনোহর কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা অপ্রয়োজন বোধে দেখা-সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া গেল। ইহাতে বিস্মিত কেহ হইল না, কেন না মনোহরের প্রকৃতিই ঐপ্রকার, লৌকিকতা আত্মীয়তার সে বড় ধার ধারে না।

মনোহরের এই যে আসা-যাওয়া—ইহাকে বড় করিয়া দেখাব প্রয়োজন কাহারও হয় না—একমাত্র টিয়ার ছাড়া। টিয়া মনোহরের এই যাতায়াত উদ্দেশ্যহীন বলিয়া প্রথম প্রথম ভাবিত সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন আর তাহা সে ভাবিতে পারে না। টিযা কাল সারারাত বিনিদ্র কাটাইয়া ছোট-মা রূপসীর কথাটাই হৃদযঙ্গমের চেষ্টা করিয়াছে এবং ছোট-মা যে নেহাত মিথ্যা কিছু বলে নাই সে-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছে। মনোহব এখানে আসে তবে তাহার দিদির সঙ্গে দেখা করিতে নয়, আসে তাহারই সঙ্গে দেখা করিতে, আসে একটু রঙ্গ-তামাসা করিতে! টিয়া এ-কথা যতবারই ভাবিয়া দেখে ততবারই ছোট-মা'ব মনের গহনে কি যে পৈশাচিক উল্লাস ভবিষ্যতের পানে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া নিথর বসিয়া আছে—একটা যোগ্য মুহুর্ত্তের জন্য তাহাই অনুমান করিয়া অন্তরে গিরিপ্রদেশের হিম-শৈত্য অনুভব করিয়াছে, কিন্তু সে জানে ইহার প্রতিবাদ তাহার শক্তি ও সামর্থ্যের বাহিরে। যদি তাহার দিক হইতে মনোহরের এই গতাযাতের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ত রূপসীর দিক হইতে অমনি আসিবে আবেগময় সমর্থন—যাহার তোড়ে

তাহার ভীরু প্রতিবাদ সামান্য তৃণখণ্ডের মত বিপুল জলধির ঘূর্ণাবর্ত্তে নিমিষে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। তাই প্রতিবাদেও তাহার প্রবৃত্তি নাই। সে জানে সে নিরুপায়।

বর্ত্তমানে মনোহর যে আবার কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছে তাহারই আনন্দে টিয়া ভোরের আলোককে শুভের সূচনা বলিয়া সহজে গ্রহণ করিতে পারিল। রাত্রের এঁটো বাসনের পাঁজা লইয়া সে খালের ঘাটে গেল, ঘাটে বাসনগুলি নামাইয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া আসিল—ছাই আর শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিতে—অবশ্য যে-ঘাটে নিত্য বাসন মাজা হয় সে-ঘাটে যে এ-সবের অভাব থাকা সম্ভব নয় তাহা জানিয়াও সে উপরে উঠিয়া আসিল—সেই বাতাবি লেবু গাছটির কাছে। এখান হইতে ভৈরব দত্তের বাড়ীর রান্নাঘরের বেড়াটা পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—আর ঐ রান্নাঘরের দক্ষিণ দিয়াই বাড়ীর উঠান হইতে খালের ঘাট পর্য্যন্ত পায়ে-চলা পথের রেখাটি আম-বাগানের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে। সুন্দরকে আসিতে হইলে ঐ পথেই ঘাটে আসিতে হইবে। সুন্দর আসিলেও আসিতে পারে। এতক্ষণে কি আর তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই! আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে যদি ঘাটে এখন চোখ-মুখ ধুইতে আসে—সে বেশ হয়! কিন্তু আবার যদি সুন্দরের মাথায় সেদিনের মত দুর্ব্বুদ্ধি চাপে, আবার যদি সে তাহাকে পূর্ব্ববৎ পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায়! টিয়া সঙ্গে সঙ্গে একবার কপালে হাত বুলাইয়া ফেলিল; কিন্তু সে-দাগ তখন আর বর্ত্তমান নাই, রাত্রের মায়ায় সে যেন কোথায় মিলাইয়া গেছে।

টিয়া ওপারের চতুর্দ্দিকে একবার তন্ন তন্ন করিয়া দৃষ্টি বুলাইল, তারপরে পাড় হইতে কতকটা দুর্ব্বা ছিঁড়িয়া লইয়া ঘাটে নামিয়া আসিল, যেহেতু ছোট-মা'র ঘুম ভাঙ্গার আগেই তাহাকে বাসন মাজিয়া ঘরে ফিরিয়া বাড়ীর উঠান, ঘরের দাওয়া প্রভৃতি নিকাইয়া রাখিতে হইবে

এমনভাবে—যেন রূপসী ঘর হইতে বাহির হইয়া ভিজা দাওয়া বা উঠানে পা ফেলিয়া না অপ্রতিভ হইয়া ওঠে পায়ের দাগ পড়ার দরুণ। তাহা হইলে টিয়ার আর রক্ষা থাকিবে না এবং যে গাল-মন্দ অবিলম্বে সুরু হইয়া যাইবে তাহা সারা দিনমান ত বিনা ক্লেশে চলিবেই, রাত্রেও থামিবে কি-না বলা দুষ্কর। তবে রক্ষা এই যে, রূপসীর যে-বেলায় ঘুম ভাঙ্গে সে সময়ের মধ্যে একটা খাল শুকাইয়া যাওয়াও খুব যে বিচিত্র একটা কিছু ব্যাপার বলিয়া ত বোধ হয় না।

টিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘাটের উপর বাসন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাজিতেছিল। গত বর্ষায় বেদিয়াদের কাছ হইতে সে যে চারগাছি রঙীন্ কাঁচের চুড়ি দুই হাতের জন্য কিনিয়াছিল তাহার দুইগাছি কবেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন যে দুইগাছি বাঁ হাতে অবশিষ্ট ছিল তাহা বাসনের গায়ে লাগিয়া মাঝে মাঝে চিন্ চিন্ করিয়া উঠিতেছিল—যে-কোন মুহূর্ত্তে হয় ত বা খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাহা ত যাইতেই পারে; সেদিকে টিয়ার কোন খেয়াল ছিল না। শুধু সর্পাকার স্বর্ণ-বলয় দুইটি সে দুই হাতের শীর্ষসম্ভব স্থানে ঠেলিয়া আঁটিয়া রাখিয়া দিয়াছিল যাহাতে বার বার সে দুইটিকে না সরাইতে হয়, কেন না কাজের তাহাতে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

টিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু মন তাহার পড়িয়া ছিল দত্তদের পাছ-দুয়ারের খালের ঘাটের দিকে।

হঠাৎ একসময় টিয়া দৃষ্টি তুলিয়া ওপারের ঘাটের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, সুন্দর একখানি বৈঠার উপর দেহের ভার আনমিত করিয়া দিয়া নির্নিমেষ বেহায়া দৃষ্টি পাতিয়া যেন তাহারই পানে চাহিয়া আছে। কুমারী কন্যার ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিবার রীতি নাই, থাকিলে টিয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিতে পারিত; কাজেই সামান্য একটু সে ঘুরিয়া বসিয়া মুখটি যথাসম্ভব আড়াল করিতে প্রয়াস পাইল এমনভাবে—যাহাতে

সুন্দরকে ইচ্ছামত সে যে-কোন অবস্থায় প্রয়োজন হইলেই দেখিতে পায়, আর সুন্দর সেই ঘাটে যতক্ষণ রহিল ততক্ষণ প্রয়োজন তাহার আর ফুরাইল না।

সুন্দর তাহাদের নৌকার 'পরে-গিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকা জলে বোঝাই হইয়া ছিল—কাজেই বৈঠাটি পাশে পাটাতনের উপর নামাইয়া রাখিয়া নৌকার ভিতরে রক্ষিত নারিকেলের মালাটি লইয়া সুন্দর জল সেঁচিয়া ফেলিতে লাগিল। আর এত ঘটা ও শব্দ করিয়া সুন্দর জল সেঁচিতে লাগিল যে ওপারে আনত-শির টিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে বাধ্য হইল। সুন্দর তাহা বুঝিতে পারিয়াও নিরস্ত হইল না। নৌকার জল সেঁচা শেষ হইলে খুব চিন্তিতের মত সে বৈঠা তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল। খালে স্রোতের তেমন কোন প্রাবল্য ছিল না যে নৌকা মুহূর্ত্তে কোথাও ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, নৌকা এক-স্থানেই যেন হেলিয়া দুলিয়া ঐকান্তিক বিরাম খুঁজিতেছিল, নৌকার উপরের আরোহী সুন্দর যেন ততোধিক। অথচ এ আচরণে সুন্দর যে টিয়ার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে তাহাও সে বুঝিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই বাধার দিকটা বহু পূর্ব্বেই শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর হঠাৎ এ বিসদৃশ অসামঞ্জস্যের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে গিয়া একটু অপ্রত্যাশিত আচরণের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। হঠাৎ বৈঠা জলে নামাইয়া একটা চাড় দিয়া নৌকার আগা-গলুইটা টিয়ার দিকে ফিরাইয়া আর একটা ঈষৎ চাপে নৌকাটিকে সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের দিকে ঠেলিয়া দিয়া অকারণ অর্থহীন উল্লাসে সহসা হাসিয়া উঠিয়াই আবার থামিয়া গেল। টিয়া তেরছা দৃষ্টিতে সকলই লক্ষ্য করিল এবং নৌকা ঘাটের দশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়ার আগেই কাপড়টা অপরিচ্ছন্ন হাতে সামলাইয়া ধরিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সহজ লঘু স্বচ্ছন্দ গতিতে পাড়ে উঠিয়া গেল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সুন্দর যেন তাহাকে ঘাট

হইতে জোর করিয়া তাহার নৌকায় তুলিয়া লইতে আসিয়াছে। সুন্দর অমনি মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বৈঠা চাপিয়া ধরিল এমন ভঙ্গীতে যেন তাহার কঠোর কর্ত্তব্য সহসা স্মরণে জাগিয়াছে। কিন্তু তখন আর লুকাইবার সাধ্য কিছু সুন্দরের ছিল না, সে টিয়ার কাছে ধরা দিয়াছে খামোখা একেবারে, এটুকু দৌর্ব্বল্য ধরা সে না দিলেও পারিত। সেজন্য আফসোস করা অবশ্য সুন্দরের স্বভাবও নয়, রীতিও নয়। সে তাই টিয়ার দিকে ফিরিয়া সহজ অবিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমি যেন কেউটে সাপ একটা, পাছে ছোবল্ মারি তাই পালালে বুঝি?

টিয়া কথা বলিবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু না বলিয়া এত বড় সুযোগকে ব্যর্থ হইতে দিতেও সে পারিল না; তাই বলিল, না, সাপ কেন হতে যাবে। শিখিপুচ্ছের সজ্জন-বংশের চিরকালের শত্রু তোমরা, তাই সেদিন পিটুলি ফল ছুঁড়ে মেরে শত্রুতার প্রথম নমুনা যা দেখালে তাতে ভয় না ক'রেও ত পারি না।

সুন্দর একটু হাসিয়া বলিল, তা শত্রু চিরদিন শত্রুই থাকে।

টিয়া এইবার বিশেষ ঠেস্ দিয়া কথা কহিল, বলিল, তা শত্রুতাই যদি করবার সাধ ত গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে এলে কেন? একেবারে সড়্কি-বল্লম নিয়ে বেরুলেই পারতে। কলঙ্কিনীর খাল আবার লালে লাল হ'য়ে উঠত, দেশের লোক সম্ভ্রম ও আতঙ্কে চেয়ে থাক্‌ত। ভৈরব দত্তের ছেলের নামে ঢি ঢি প'ড়ে যেত—সেই-ত বেশ হ'ত।

হুঁ, তা হ'ত বই কি! কিন্তু ভৈরব দত্তের ছেলে ত আর তা' বলে নিশি সজ্জনের মেয়ের সঙ্গে লড়াই করতে বেরুতে পারে না সড়্কি-বল্লম নিয়ে! দেশের লোক যে হাসবে তা হ'লে!—বলিয়া সুন্দর মৃদু একটু হাসিয়া আবার বলিল, তাই ত সড়্কি-বল্লম ছেড়ে এবার তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়েচি। দেখা যাক্ ফলাফল!

টিয়া সহসা বলিয়া ফেলিল, অ! টিয়া পাখী বিঁধবার মতলবে বুঝি এবার তীর-ধনুক সম্বল করেচ? ঠিকই ত, যার যেমন অস্ত্র!

বলিয়া ফেলিয়াই টিয়া মুহূর্ত্তে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুন্দর টিয়ার কথা বলার অপূর্ব্ব ভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইল, টিয়ার সলাজ বঙ্কিম পলায়ন-তৎপর ভঙ্গীটি আরও চমৎকার, আরও মনোমুগ্ধকারী। সুন্দর আজিকার ভোরের এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে সার্থক জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ ও বর্ষণক্লান্ত রাত্রের পর ভিজা সূর্য্যের সলাজ উঁকি-ঝুঁকির মত অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিল।

বাসনগুলি ঘাটেই পড়িয়া রহিয়াছে, কাজেই টিয়া বেশীক্ষণ আর বাগানের মধ্যে অর্থহীন ঔদাস্য লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিল না। কিন্তু সুন্দর তখনও সেই ঘাটের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে নৌকা লাগাইয়া অপেক্ষা করিতেছে কি-না কে জানে, সেই ভয়েই সে ঘাটের দিকেও অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। একটু একটু করিয়া ভয়-বিব্রত পদে সে আবার ঘাটে নামিয়া আসিল। সুন্দর আশে-পাশে কোথাও নাই দেখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বাসনগুলি মাজিয়া ঘষিয়া আবার যখন সে সেগুলিকে পাঁজা করিয়া বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিল তখন বেশ বেলা চড়িয়া গিয়াছে, কারণ তখনই ঠিক তাহার সৎ-মা রূপসী তাহার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া একটি কঠিন অসন্তোষ-ব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় নিবিড় আলস্য ভাঙ্গিতে গা মট্‌কাইতেছিল। টিয়াকে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াই মুহূর্ত্তে সে কঠিন একটি সরল রেখায় স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইল এবং টিয়া একটি ঢোক্ গিলিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল—কি, মনোহর বিদেয় হয়েচে বুঝি, তার ঘরের দরজা যে খোলা রয়েচে দেখচি? আবার কবে আসবে ব'লে গেল শুনি?

টিয়া বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল, কেন, সে কি আমার আত্মীয়-কুটুম্ব যে আমাকে ব'লে যাবে? ব'লে যদি কিছু যেতই ত সে ত তোমাকেই ব'লে যেত, আমাকে কিসের জন্যে বলতে যাবে শুনি?

না, আমার তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি কি-না সে জন্যেই একথা জিগ্যেস্ করলাম। যদি তোকে কিছু ব'লে গিয়ে থাকে—এই আর কি!—বলিয়া রূপসী নিজের পুরু ঠোঁট কেমন একটু জিব দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে সামলাইল।

টিয়াও রান্নাঘরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, সে হয় ত রাত থাকতেই উঠে চ'লে গেচে, আমার ঘুম তখনও ভাঙ্গে নি।

রূপসী দেখিল, এদিকে তেমন সুবিধা করা গেল না, আর একদিক দিয়া তাহাকে তবে আক্রমণ করা যাক্। অমনি সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, তখনও ঘরের দাওয়া ও উঠান নিকানো শেষ হয় নাই। রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়াইয়া তাই সে ডাকিল, অ টিয়া, বলি রাত থাকতে উঠে ত ঘাটে যাওয়া হয়েছিল, আর ফেরা হ'ল ত এই বেলা ন'টা নাগাদ! বাবা! বাবা! কি যে মেয়ের মনের কথা, আর কি যে তার কাজের ছিরি! এ যেন পরের বাড়ীর কাজ করা হচ্ছে, প্রাণ নেই কোন কাজে। বলি, এই এত বেলায়ও ঘর-দোর-উঠান সবই ত প'ড়ে আছে, একটু গোবর জলের ছিঁটে বুলোতেও এত আলিস্যি! আমারও যেমন কপাল!

টিয়া রান্নাঘরে বাসন নামাইয়া রাখিয়া নিরুত্তরে আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট-মা'র সকল কথাই তাহার কানে গিয়াছিল, কিন্তু উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া সে বোধ করিল না। অবশ্য, উত্তর দিলে বিপদ বেশী এবং উত্তর না দিলেও সে বিপন্মুক্ত নয়, কাজেই বৃথা বাক্য-ব্যয়ের স্পৃহা তাহার মধ্যে জাগিল না। ঘরের দাওয়া ও উঠান নিকানোর কাজেই সে নিজেকে ব্যাপৃত করিল। রূপসী আশে-পাশে ক্ষণিকের জন্য বাক্য-মুশল ঘুরাইয়া টিয়াকে হতভম্ব করিয়া দেওয়ার

চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু তেমন কোন কিছু সে তন্মুহূর্ত্তেই হাতড়াইয়া না পাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইয়া শেষে বলিয়া ফেলিল, অনেক দেমাকী দেখেছি এযাবৎ, মাকে দেখিনি, কিন্তু তার ছা'টিকে দেখ্‌ছি ; আর এই যদি তার নমুনো হয় ত ভগবান আমাকে খুব বাঁচান বাঁচিয়েছেন—

বলিয়া রূপসী আপন বাক্-পটুতার ভূয়সী গর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল চোখ মুখ ধুইতে—সর্ব্বাঙ্গে তখনও তাহার জড়াইয়া আছে রাত্রির অবসাদ, যেমন করিয়া ভোরের দুর্ব্বাদলকে জড়াইয়া থাকে রাত্রের শিশির।

টিয়ার সহসা আজ আবার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে আজ প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর আগেকার কথা—যখন সজ্জন-বাড়ী বলিতে সেই একমাত্র মহিয়সী নারীর কথাই সর্ব্বাগ্রে সকলের মনে জাগিত। এখনও তাহার সুখ্যাতি গাঁয়ের ঘরে ঘরে কারণে-অকারণে উচ্চারিত হইয়া থাকে। রূপসীর কানেও সেকথা যে লোকে গুঞ্জরণ করে নাই এমন নয় এবং তাহা হইতেই রূপসীর কেমন একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সে চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া বসবাস করিতেছে, কাজেই পাড়ার অন্যান্য মেয়ে ও বধূদের কাহারও সহিত সে তেমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই বা চাহেও নাই।

টিয়া সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল দিয়া মায়ের স্মৃতি-তর্পণ করিল এবং মুহূর্ত্তে আবার তাহা সে সাম্‌লাইয়াও উঠিল। টিয়ার মন অনেকটা বালির মত—দাগ পড়িলেও মিলাইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না, জল পড়িলেও অবিলম্বে আবার তাহা শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

কিন্তু এই যে বালির মত টিয়ার মন সে-মনেও একটা জিনিব গভীর-ভাবে দাগ কাটিয়াছে এবং সে-দাগ আর কখনও মিলাইবে বলিয়াও ত মনে হয় না—সে সুন্দর। সুন্দরকে তাহার ভাল লাগিয়াছে, বড় ভাল লাগিয়াছে, যেমন ভাল লাগে বিজয়োদ্ধত ফেনোর্ম্মি-উচ্ছ্বসিত সাগরকে

বেলাভূমির—ঠিক তেমনটি। ফলে ঘাটের কাজ তাহার বাড়িয়াছে, একবারের জায়গায় যে কতবার সে বাতাবি লেবু গাছটার তলা দিয়া ঘাটে যাইতেছে তাহার আর ঠিক নাই। কিন্তু বেশী সময়ই তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, কেন না সুন্দরের দেখা প্রায়ই মেলে না।

সজ্জন-বাড়ীর সাম্‌নের দিকে শিখিপুচ্ছের রায়েদের একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। সেই দীঘির জলই শিখিপুচ্ছের গৃহস্থের পানীয় জল। প্রত্যহ বৈকালের দিকে গ্রামের মেয়ে ও বধূরা দল বাঁধিয়া পশ্চিম দিকের শান-বাঁধানো ঘাটে যায় গা ধুইতে ও কলসী ভরিয়া পানীয় জল তুলিয়া আনিতে। টিয়া এতদিন বৈকালে সেখানেই গা ধুইতে ও কলসী ভরিয়া জল আনিতে যাইত; কিন্তু এখন শুধু সে একবার যায় কলসী ভরিয়া পানীয় জল তুলিয়া আনিতে এবং গা-ধোওয়ার কাজ খালের জলেই অনায়াসে চলিতে পারে বলিয়া অধুনা তাহার ধারণা জন্মিয়াছে ও তাহাই সে মানিয়া চলিতেছে।

সেদিনও তাই টিয়া রান্নার ও পানীয় জল রায়েদের দীঘি হইতে কলসী ভরিয়া আনিয়া দিয়া একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া খালের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু আশে-পাশে চতুর্দ্দিকে বেশ একটা ছায়া-সুনিবিড়তা বিরাজ করিতেছে, শুধু পাখীর কলকাকলি অদূরের বন-বিতানে একটা তন্দ্রাতুর মূর্চ্ছনা জাগাইয়া রাখিয়াছে।

টিয়া ক্ষণিকের জন্য একবার বাতাবি লেবুর আভূমি-নুইয়াপড়া ডালটার উপর মাটিতে পা রাখিয়া উপরের আর একটা ডাল ধরিয়া বসিয়া রহিল কিসের যেন প্রতীক্ষায়। সুন্দরদের ঘাটের নৌকাটি তখন ঘাটে ছিল না। হয় ত সুন্দরই নৌকাযোগে কোথাও বাহির হইয়াছে। এখনই হয় তো আবার ফিরিয়া আসিবে—নাও আসিতেপারে। খাল দিয়া পর পর তিন-চারখানি নৌকা চলিয়া গেল—তন্মধ্যে একখানি আবার বেপারীদের নৌকা। সব নৌকাই উত্তর দিকে উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে বকফুলী

নদীর উদ্দেশ্যে হয় ত, মাত্র একখানি দক্ষিণ দিকে স্রোতের মুখে মুখে চলিয়া গেল হাজারখুনীর বিলের পানে। এই হাজারখুনীর বিল এ-অঞ্চলের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ জিনিষ—বর্ত্তমানে তাহার যে-কোন এক পার হইতে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় রওনা হইলে অপর পারে পৌঁছিতে সূর্য্য অস্তে নামিয়া যায়, এত বড় বিল এ-অঞ্চলে আর নাই। আবার গ্রীষ্মকালে হাজারখুনীর বিলের মাঝ দিয়া পায়ে-চলা পথও প্রস্তুত হয়—শুধু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে জল বারোমাসই বর্ত্তমান থাকে এবং সেগুলিকে অনেকটা বৃহৎ পুষ্করিণী বা দীঘির মত দেখিতে হয়। বর্ষাকালে হাজার-খুনীর বিল নৌকায় পাড়ি দেওয়া বেশ বিপদসঙ্কুল—কেন না একটু জোরে বাতাস বহিতে সুরু করিলেই জলরাশি উত্তাল হইয়া ওঠে—এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত সাগর-সদৃশ ঢেউ উচ্ছল কলহাসি হাসিয়া ওঠে আর ঝড় উঠিলে ত কথাই নাই। হাজারখুনীর বিলের তাই নাম-ডাক আছে। উত্তর দিকের বকফুলীরও নাম-ডাক আছে—অশান্ত দামাল বলিয়া নয়, বরং তাহারই উল্টা; তবে বকফুলীরও স্রোত সাধারণ নদী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খরধার। দুই পাড়ে নানা গঞ্জ, বাজার-হাট, বসতি-বহুল গ্রাম, মঠ ও মাঠ রাখিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার গতি। বকফুলীই এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রশস্ত রাজপথ। দিনে ও রাত্রে তিনখানি ষ্টীমার এই বকফুলী দিয়া যাতায়াত করে, মোটর-বোট বা লঞ্চের ত কথাই নাই। আর নৌকা চলে অসংখ্য—দিবারাত্রের সমস্ত সময় জুড়িয়া।

টিয়া কখন যে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল নিজের চিন্তায় তাহা নিজেও সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল ওপারে সুন্দরের গলা শুনিয়া। সুন্দর পাড়ে দাঁড়াইয়া নৌকার 'পরে উপবিষ্ট তাহারই সমবয়সী শ্রীমন্তকে ডাকিয়া বলিল, উঠে আয় শ্রীমন্ত। আজ জ্যোৎস্না রাত আছে, রাত ক'রে যাওয়া যাবে'খন হাজারখুনীর বিলে।

শ্রীমন্ত একলাফে ডাঙায় গিয়া উঠিল। তারপরে সুন্দরের একটা

হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, অই যে—ওপারে, ওই ত নিশি সজ্জনের মেয়ে টিয়া না ?

শ্রীমন্ত আস্তে করিয়া কিছু আর বলে নাই। কাজেই টিয়ার কানে তাহার সব কথাই পৌঁছিল। সুন্দর কি যেন শ্রীমন্তর কানের কাছে মুখ লইয়া আস্তে করিয়া বলিয়া একটা ঝটকা টানে শ্রীমন্তকে বাগানের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। শ্রীমন্ত সুন্দরের টানে আত্মসমর্পণ করা সত্বেও একবার পিছু ফিরিয়া টিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেলিল। টিয়া অমনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। টিয়া ইতিপূর্ব্বে শ্রীমন্তকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে, আর শ্রীমন্তও যে টিয়াকে দেখিয়াছে তাহাতে টিয়ার সন্দেহ নাই। তবে শ্রীমন্ত কেন যে আজ আবার তাহাকে এমন বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইল তাহা কে জানে। হয় ত সুন্দর তাহারই সম্বন্ধে শ্রীমন্তকে কিছু বলিয়াছে এবং বিশেষ কিছুই হয় ত বলিয়াছে। টিয়ার সহসা মুখে-চোখে কেমন যেন একটু লজ্জার রং ধরিল। আবার মুহূর্ত্তে নিজেকে সে সামলাইয়া লইয়া ঘাটে নামিল। যত দ্রুত সম্ভব গা-ধোওয়া অনাড়ম্বরে শেষ করিয়া শ্রীমন্তর ফিরিয়া চাওয়ার যথাকারণ গবেষণা করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ভিজা কাপড় পরিয়াই বাতাবি লেবুর গাছের ডালের উপর রক্ষিত শুক্‌নো কাপড়খানি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঘাটে কাপড় ছাড়িতে আজ তাহার কেমন যেন বাধিল।

রাত্রে নিরালা নির্জ্জন অন্ধকার শয্যায় নিদ্রাহীন চোখ বুজিয়া টিয়া চেষ্টা করিতেছে কলঙ্কিনীর খাল দিয়া একখানি নৌকা চলার শব্দ শুনিতে, কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে। একবার যেন সে ঐ খালের দিক হইতেই একটা বাঁশের বাঁশী ফুকারিয়া উঠিতে শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া তাহার মনে হয়, কিন্তু ভাল্ করিয়া কিছুই সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। হইতে পারে—সুন্দর আর শ্রীমন্ত খাল দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে হাজারখুনীর বিলের

দিকে, তাহাদেরই মধ্যে কেহ হয় ত বাঁশী বাজাইতেছে—আবার তাহা না'ও হইতে পারে। বাহিরে জ্যোৎস্না তখন ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। আজ রাত্রে সুন্দর আর শ্রীমন্ত হাজারখুনীর বিলে ত নৌকা লইয়া বিলাস-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। না জানি তাহারা কাহার কথা একান্তে আলোচনা করিতেছে। হইতে পারে ত—যে শ্রীমন্ত সুন্দরকে টিয়ার কথা তুলিয়া বিব্রত করার প্রয়াস পাইতেছে। তাহা ত আর খুব কিছু অসম্ভব না। কারণ শ্রীমন্ত আজ বৈকালের দিকে টিয়াকে ঘাটে অমন বার বার নিরীক্ষণ করিয়া তবে দেখিল কেন? নিশ্চয় তবে তাহাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া কথা উঠিয়াছে আর এই রাত্রে নিঃসঙ্গ আকুলতার মধ্যে উভয়ে অত কাছাকাছি নৌকায় বসিয়া তরঙ্গায়িত জ্যোৎস্নার নিবিড়তম আবেশের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া সেকথা নূতন করিয়া তুলিবে না কি! হয়ত তুলিলেও তুলিতে পারে। আবার টিয়ার কেমন জানি মনে হয়, না তুলিয়া তাহাদের যেন আর নিস্তার নাই। সেই পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া মারার গল্প কি আজ সুন্দর না করিবে। লজ্জায় টিয়ার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। টিয়ার ঘরের পিছনের বাগানের নিস্তব্ধ গভীর বিজনতা ভাঙিয়া দিয়া—একটা কি পাখীর ডানা যেন ঝট্‌পট্‌ করিয়া উঠিল—তারপরেই রাত্রের নিস্তরঙ্গ বুকে ঘা মারিয়া গুরু গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইল—বুদ্‌-বুদুম্‌। টিয়ার এ ডাকের সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল তাই; তাহা না হইলে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠাও কিছু অন্যায় হইত না। পাখীটির নাম ভূতুম-পেঁচা, যেমন কদাকার ও বিশাল তাহার মূর্ত্তি, তেমনই আবার বিপুলায়তন ঘোরালো দুইটি চক্ষু, আবার ডাকটিও তেমনই ভয়-জাগানে। নিশীথে সহসা প্রথম পরিচয় ঘটিলে সংজ্ঞা হারানো খুব আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া কেহ বিবেচনা করিবে না। টিয়ার পূর্ব্ব-পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কেমন জানি ভয় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে সে হাজারখুনীর বিলে সুন্দরের নৌকা যে ছলাৎ-ছল শব্দ তুলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা ভুলিয়া গেল।

বকফুলীর দিক হইতে একটা মোটর-বোটের সিটির ফুঁ যেন দিগ্-দিগন্ত মাড়াইয়া দিল। টিয়া নিদ্রায় সমস্ত ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা পাইল।

সকালবেলা শ্রীমন্ত সোজা একেবারে সজ্জন-বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমন্ত বনপলাশীর অনাদি ঘোষের তৃতীয় পুত্র। এককালে অনাদি ঘোষের পয়সা ছিল—এখন আছে শুধু দেমাক। টিয়া উঠানে একটা বঁটি পাতিয়া একরাশ নারিকেল পাতা লইয়া পাতা হইতে কাঠিগুলি ছাড়াইতেছিল, আর একপাশে সেগুলিকে জড়ো করিয়া রাখিতেছিল। এমন সময় শ্রীমন্ত সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। টিয়া ক্ষণিকের জন্য একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল। তারপরেই আবার সে সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

শ্রীমন্ত আশে-পাশে আর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া টিয়াকেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ টিয়া, তোমার বাবা গেলেন কোথা ?

টিয়া সলাজকণ্ঠে জবাব দিল, বাবা এই ত এতক্ষণ এখানেই ছিলেন, আবার বুঝি রায়েদের বাড়ীর দিকেই গেলেন তবে। আপনি দাওয়ায় উঠে চেয়ারটায় বসুন না—আমি রায়েদের বাড়ী থেকে বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি।

বলিয়া টিয়া কাপড়টা সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীমন্ত অমনি বলিল, না থাক, তোমার আর কষ্ট ক'রে রায়েদের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, আমিই বরং পথে তাঁর সঙ্গে দেখাটা ক'রে যাব'খন।

টিয়া অধিকতর লজ্জাকাতর একটি ভঙ্গিমায় বলিল, না, কষ্ট আর কি!

তবু!—অতি আস্তে করিয়া বলিয়া শ্রীমন্ত মুহূর্তে টিয়ার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা প্রখর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। টিয়ার সহসা মনে হইল, শ্রীমন্ত যেন তাহাকেই দেখিতে আসিয়াছিল; দেখা হইয়াছে, চলিয়া গেল। কাজ শুধু তাহার অছিলা মাত্র। একথা মনে জাগার সঙ্গে

সঙ্গেই টিয়ার সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন বিসদৃশ ও শ্রীমন্তর পক্ষে বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শ্রীমন্ত ইহা ভাল করে নাই, এই কথাই তাহার কেবল মনে জাগিতেছিল।

শ্রীমন্ত চলিয়া গেলে রূপসী তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, অ টিয়া, ও এসেছিল কে শুনি ?

ছোট-মা'র কথার ভঙ্গীতে টিয়ার সর্ব্ব শরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখিয়া বলিল, বনপলাশীর অনাদি ঘোষের ছেলে শ্রীমন্ত ঘোষ এসেছিল বাবার খোঁজে।

অঃ! আমি বলি কে না কে আবার! বলিয়া রূপসী আবার তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

সুন্দর বাড়ীর প্রশস্ত উঠানে একখানি মোড়ার উপর বসিয়া একটি অতি ধারালো কাটারি লইয়া একখানি সুপারির বৈঠা চাঁচিয়া তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় সেখানে শ্রীমন্ত সারা মুখে দুষ্ট বাঁকা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া প্রবেশ করিল। সুন্দর মুখ তুলিয়া চাহিতেই শ্রীমন্ত ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হঁ, দেখে এলাম, দেখবার মতই বটে!

সুন্দর বিব্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, আঃ, চুপ কর্। তোর যদি একটুও কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান থাকে।

এমন সময় সুন্দরের মা পূর্ণলক্ষ্মী ঘরের দাওয়া হইতে একখানি মোড়া লইয়া উঠানে তাহাদের কাছে নামিয়া আসিয়া মোড়াটি শ্রীমন্তর কাছে মাটিতে পাতিয়া দিয়া বলিল, বোস্‌রে শ্রীমন্ত, দাঁড়িয়ে থাকবি কেন। সুন্দরের যেমন—লোক এলে বসতে দিয়ে তবে ত তার সঙ্গে কথা বলে বাপু, তা না—যে এল সে দাঁড়িয়েই থাকুক। নিজের মোড়াটাও ত ওকে ছেড়ে দিতে পারতিস্।

—হুঁ, তা পারতাম মা—সুন্দর এইখানে একবার থামিয়া বলিল, কিন্তু ও যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এসেচে!

পূর্ণলক্ষ্মী চমৎকার একটু হাসিয়া বলিল, তোমার সর্ব্বনাশ করবার জন্মে ত লোকের চোখে নিদ্রে নেই। শ্রীমন্তকে আমি চিনি—সে যাবে তোমার সর্ব্বনাশ করতে! শোন দিকিনি ছেলের কথা!

তুমি তবে চেনো ওকে ছাই, ও একটি বিচ্ছু, ও না পারে এমন কাজই দুনিয়ায় নেই।—বলিয়া সুন্দর ভ্রূভঙ্গী করিল।

শ্রীমন্ত এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, না জ্যোঠাইমা, ওর কেন আমি সর্ব্বনাশ করতে যাব শুনি? বরং সর্ব্বনাশ যাতে না হ'তে পারে তাই দেখব। তা কি ও স্বীকার করবে! আর একথা ও বলেচে তোমাকে শুধু ভয় দেখাবার জন্মেই জ্যেঠাইমা।

—সে কি আর আমি বুঝি না শ্রীমন্ত।—বলিয়া পূর্ণলক্ষ্মী আপনার কাজে চলিয়া যাইতেছিল, আবার সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হ্যাঁরে শ্রীমন্ত, দুধ-কলা দিয়ে মুড়ি দেব, খাবি চারটি? কাঞ্চনপুরের তাল-পাটালি আছে ঘরে। সেদিনও দিতে চাইলাম, খেয়ে যাবার তোদের সময় হ'ল না।

—তা ছাড়বে না যখন, দাও।—বলিয়া শ্রীমন্ত সুন্দরের দিকে ফিরিয়া বলিল, ও আবার কিছু ভাবলে কি-না কে জানে। কিন্তু ভাল ক'রেই এবার দেখে এসেচি—এমন কি, বাঁ দিককার তিলটা পর্য্যন্ত।

সুন্দর কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, বলিস্ কি! তা দেখতে গেলি, খাবার-দাবার খাইয়ে তবে ছাড়লে ত?

—তা আর না! আমি তখন পালাবার পথ খুঁজচি। বলে কি-না আবার আদর-আপ্যায়ন! পালিয়ে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সুন্দর ইতিমধ্যে আবার বৈঠাটির দিকে নজর দিয়াছিল। কাজেই শ্রীমন্তর কথার আর কোনও উত্তর দিল না, বা নূতন কোন কথাও আর

খুলিল না। শ্রীমন্ত ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল, তবে তুই বৈঠাই চাঁছ, আমি পালাই।

বলিয়া শ্রীমন্ত উঠিতে যাইতেছিল, সুন্দর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, বাঃ, পালাবি কি রকম? আমি ত কোন কথাই তোর শুনিনি এখনও। সব হুবহু আমাকে বলবি তবে ত তোকে ছাড়ব। পালালেই হ'ল যেন! মা কখন আবার ঝট্ ক'রে এসে পড়েন সেই ভয়েই ত তোকে বলতে দিচ্ছি না।

শ্রীমন্ত ভান রাখিয়া আবার চাপিয়া বসিল।

সুন্দর তখন বলিল, ভাল কথা, আজ নূপুরগঞ্জের হাটবার ত, যাবি একবার হাটে?

—কেন, তোর কি কাজ আছে কিছু? বাড়ীর জন্যে কিছু সওদা করতে হবে নাকি?

—না, এম্‌নিই একবার যাব ভাবচি। অনেক দিন যাইনি, গেলে মন্দ হয় না। সন্ধ্যের সময় ফেরবার পথে বকফুলী পার হ'য়ে নৌকো বেয়ে আসতে চমৎকার লাগবে।

—তা ত চমৎকার লাগবে! কিন্তু সত্যি কি সেই কারণেই শুধু নূপুরগঞ্জের হাটে যাবি?

—হুঁ, তা, তা একরকম শুধু শুধুই বই কি।

শ্রীমন্ত সুন্দরের কথা শুনিয়া কেন জানি একটু হাসিল। তারপরে বলিল, কার জন্যে কিনবি সে ত আমার জানাই আছে, কিন্তু কি কিনবি আগে জানতে পাই না কি?

সুন্দর তখন জোর দিয়া বলিল, সত্যি কিছু কিনব না, কাউকে কিছু দেবও না, একটু ঘুরে আসবার জন্যেই শুধু যাব।

—বেশ, তবে তাই। তা যাওয়া যাবে। আর—সে জন্যেই কি বৈঠা তৈরী হ'চ্ছে নাকি?—বলিয়া শ্রীমন্ত মুখ ফিরাইতেই দেখিল, সুন্দরের

মা একটি বাটিতে করিয়া দুধ-কলা-মুড়ি-পাটালি ও এক গ্লাশ জল লইয়া আসিয়া উপস্থিত। শ্রীমন্ত হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিল।

পূর্ণলক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই সুন্দর বলিল, দেখতে যাওয়ার জলপানি, ঘুষ বল্‌তেও পারিস্‌। কিন্তু মনে থাকে যেন। তা যে-কোন এক পক্ষ থেকে আপ্যায়িত হ'লেই হ'ল।

শ্রীমন্ত অমনি বলিল, ও তাই নাকি? তবে ত জ্যেঠাইমাকে ডেকে আমার শুনিয়ে যাওয়া উচিত—কেমন দেখলাম।

—থাক্‌ বাহাদুরিতে আর কাজ নেই!—বলিয়া সুন্দর আবার বৈঠার প্রতি মন দিল।

শ্রীমন্ত দুধ-কলা-মুড়ি-পাটালি একত্রে মাখিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে সত্যিই যাবি তুই আজ নূপুরগঞ্জের হাটে?

সুন্দর বলিল, নিশ্চয়।

শ্রীমন্ত বলিল, তবে এক কাজ করিস্‌, আমাদের ঘাটে নৌকো লাগিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যাস্‌।

তা যাব'খন।—বলিয়া সুন্দর নিজের মনে মনেই কেন জানি একটু হাসিল।

শ্রীমন্ত কিন্তু তাহা লক্ষ্য করে নাই।

বকফুলী নদীর ওপারটারই নাম নূপুরগঞ্জ। এই নূপুরগঞ্জের ঘাটেই ষ্টীমার ভিড়িয়া থাকে। আর ষ্টীমারঘাটা হইতে সামান্য কিছু পশ্চিমে প্রায় নদীর তীরেই নূপুরগঞ্জের হাট। সপ্তাহে এক দিন মাত্র এখানে হাট জমে, কিন্তু মস্ত বড় হাট জমে; আর কত দূর দেশ হইতে যে বেপারীর দল মালপত্র বোঝাই দিয়া দুই মাল্লাই, তিন মাল্লাই, চার মাল্লাই, এমন কি ততোধিক বিরাট ঘাসি নাও লইয়া আসে তাহা সত্যই ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। হাটের দিনে নূপুরগঞ্জে জন-সমাগম আর বকফুলীর উত্তর

পাড়ে নৌকার সমাগম একটা দেখিবার বস্তু। বকফুলীতেও নৌকা চলাচলের আর বিরাম থাকে না, বকফুলীতে সে যেন নৌকা-উৎসব সুরু হইয়া যায়। এই হাটের দিনে বকফুলী দিয়া চলাচল করিতে ষ্টীমার ও মোটর-বোটগুলির খুব অসুবিধা যে হয় তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

নূপুরগঞ্জের হাটের লাগাও পশ্চিমে একটা কাটা খাল আছে, বকফুলী হইতে তাহা কিছুদূর পর্য্যন্ত গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ হইয়া গেছে। এই কাটা খাল পূর্ব্বাহ্নেই নৌকায় নৌকায় একেবারে ছাইয়া যায়, তিল-ধারণের আর স্থান থাকে না। এই খাল হইতে নৌকা বাহির করিয়া আনা শেষে এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

বেলা তিনটা সাড়ে-তিনটা নাগাদ সুন্দর শ্রীমন্তদের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগাইল এবং বাড়ীর চাকর গঙ্গাকে নৌকায় রাখিয়া শ্রীমন্তকে ডাকিয়া আনিতে পাড়ে উঠিয়া গেল। শ্রীমন্ত সুন্দরের ডাকের জন্য একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই ছিল। উভয়ে আসিয়া নৌকায় উঠিল, দুইজনে দুইটি বৈঠা তুলিয়া লইল, শ্রীমন্ত গিয়া পিছু গলুইয়ে হাল ধরিয়া বসিল। আর গঙ্গা সুন্দরের আদেশ মত মাঝখানে পাটাতনের উপর নিশ্চুপ বসিয়া রহিল।

খালে নৌকা কিছুদূর অগ্রসর হইতেই শ্রীমন্ত মৃদু হাসিয়া সুন্দরকে বলিল, এখন সত্যি ক'রে বল্ ত—পাখীর জন্যে কি কি কিনবি ঠিক করেচিস্?

সুন্দরও সলজ্জ একটু হাসিয়া উত্তর দিল, পাখীর জন্যে কিনতে হ'লে ত কিনতে হয় একটা দাঁড়, আর কিছু ছোলা।

শ্রীমন্ত বলিল, রাখ্ তোর ফাজলামি সুন্দর, আমি যেন তোর মনের কথা কিছুই আর ধরতে পারিনি। এখন যা বলি তাই শোন্, মাধবী-কঙ্কনের জোলারা ত হাটে তাঁতের শাড়ী নিয়ে আসে নানা রঙ্-বেরঙের —তারই একটা পছন্দ ক'রে কিনে নেব'খন, চমৎকার মানাবে!

হুঁ, তা মানাবে জানি, কিন্তু দেবে কে শুনি? আবার শেষে কি বহুপুরুষের শত্রুতায় নতুন ক'রে রঙ্ চড়াব নাকি?—বলিয়া সুন্দর হাসিল।

—তা কেন, শত্রুতা চিরদিনের মত শেষ ক'রে দিবি, যাতে আর শত চেষ্টায়ও কারও নতুন রঙ্ না চড়ে।—বলিয়া শ্রীমন্ত পাল্টা হাসি হাসিতে লাগিল।

এমন করিয়া ঠারে ও ইসারায় হাসি-তামাসার ভিতর দিয়া তাহারা বকফুলীতে আসিয়া পড়িল। বকফুলীতে স্রোতের টান ভীষণ—গঙ্গাও কাজে কাজেই আর একখানি বৈঠা তুলিয়া লইল। স্রোতের টানের সঙ্গে যুদ্ধে মাতিয়া ওঠায় রঙ্গ-কথা তাহাদের আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিল।

গঙ্গাকে নৌকায় রাখিয়া উভয়ে তাহারা নূপুরগঞ্জের হাটে উঠিয়া গেল। হাটে পা দিয়াই সুন্দর বলিল, হাটে এসেছি কেন জানিস্ শ্রীমন্ত? তোরা কেউ হাজার ভেবেও তা ঠিক করতে পারবি না। কিন্তু যদি তা না পাই, সব দিন ত হাটে তা ওঠেও না।

শ্রীমন্ত বলিল, কি এমন অপরূপ জিনিষ তা শুনি আগে?

সুন্দর বলিল, হাস্‌বি না বল্—একটা টিয়াপাখী কিনব ব'লে এসেছি।

—টিয়াপাখী? সত্যি?—শ্রীমন্তর যেন তাহা বিশ্বাসই হইতেছিল না।

সুন্দর বলিল, সত্যি। আর এত সত্যি যে, এর চেয়ে বড় কিছু সত্যি হয় না, হ'তে পারে না।

শ্রীমন্তের সহসা কেন জানি সুন্দরের মতলবটা অতি অভিনব, চমৎকার ও কৌতুকপ্রদ বলিয়া মনে হইল। সে আনন্দে তাই সুন্দরের একটা হাত ধরিয়া তাঁহাকে অতি কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, মাঝে মাঝে ত হাটে উঠতে দেখেচি, আজ যেমন ক'রে হোক্ একটা খুঁজে বের করতে হবে কিন্তু। টিয়া ভারি জব্দ হ'য়ে যাবে তা হ'লে। এ কিন্তু আজ পাওয়াই চাই।

—তবে যে আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছিল না?—বলিয়া সুন্দর হাসিতে লাগিল।

শ্রীমন্ত বলিল, তখন কি আর সব দিক ভেবে দেখেছিলাম যে হবে। সত্যি, চমৎকার হয় কিন্তু তা হ'লে! ভাগি মজা হয়! চমৎকার!

শিখীপুচ্ছের কমল গোঁসাইয়ের মেয়ে নবদুর্গা আবার শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে আজ অপরাহ্নে। ফিরিয়া আসার অনতিবিলম্বেই সে টিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, সঙ্গে তাহার আসিল অমিয় সারকেলের দ্বিতীয়া কন্যা বাব্‌লি।

নবদুর্গার সাড়া পাইয়া টিয়া আনন্দে উঠানে নামিয়া আসিল এবং নবদুর্গা ও বাব্‌লিকে লইয়া গিয়া পশ্চিমের বড় ঘরটার দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিতে দিল।

টিয়া কিছুক্ষণের জন্য নবদুর্গার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। নবদুর্গাকে সত্যই বড় চমৎকার দেখাইতেছিল। নবদুর্গার মুখে কেমন একটি পরিপূর্ণ কৌতুক-উল্লাস, সারা অঙ্গে কেমন জানি ঢল নামিয়াছে, চোখ দুইটিতে আনন্দ যেন উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে, কপালে সিঁদুর যেন আশাতীত মানাইয়াছে, হাতের বালা ও চুড়ি কয়গাছি যেন সোহাগে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, কানের স্বর্ণদুল দুইটি থাকিয়া থাকিয়া ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া উঠিতেছে, গলার 'পরে মপ্‌ চেন্‌টি যেন ভরা নদীতে চাঁদের রেখাটির মত দেখাইতেছে। নবদুর্গার ভাব-ভঙ্গী কথা-বার্ত্তা চাল-চলনে আসিয়া গিয়াছিল একটা সলজ্জ সোহাগের জড়িমা। এই কয়দিনেই কিন্তু নবদুর্গা নূতন জীবনের আভাস অঙ্গে জড়াইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল। নবদুর্গাকে টিয়ার আজ ভারি ভাল লাগিতেছিল।

নবদুর্গা পূর্ব্বের চাইতে একটু মোটাও যেন হইয়াছে। টিয়া তাই ঠাট্টা করিয়া প্রথম বলিল, মাসখানেকও স্বর্ণকমলে থাকিস্‌নি বোধ করি, আর এরই মধ্যে কি মোটাই হ'য়ে এসেচিস্‌ দুর্গা, আমাদের অবাক ক'রে ছাড়লি তুই।

বাব্‌লি বলিল, আর বছরখানেক সেখানে কাটালে ত তুই দেখতে হবি একটা শাদা হাতীর মত। বাবা! বাবা! এখনই যা দেখতে হয়েচিস্‌!

নবদুর্গা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপরে বলিল, যাঃ, তোদের আবার যত বাড়াবাড়ি কথা! তা একটু মোটা হয়েচি বই কি!

টিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, একটু নয়, বেশ মোটা হয়েচিস্‌। তারপরে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জায়েরা তোর কেমন হ'ল তাই বল্‌?

নবদুর্গা বেশ একটু সময় লইয়া ভিতরে ভিতরে কৌতুকোচ্ছল হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিল, শ্বশুর-শাশুড়ী আমার চমৎকার লোক, সবচেয়ে চমৎকার আমার মেজ ননদ—নাম তার কনকচাঁপা—সবাই ডাকে কনক-দিদি, আমার চেয়ে বছর তিন-চারের বড় হবেন হয় ত, কিন্তু সে তার চেহারা দেখে ধরবার জো-টি নেই, বিয়ে হয়েচে তার চন্নদুলের জমিদারদের ছেলের সঙ্গে। চব্বিশ ঘণ্টা মুখে তার হাসিটি যেন লেগেই রয়েচে, আর সময় নেই অসময় নেই কাজ না থাকলেই তার কেবল তাস পেটা—সঙ্গে ক'রে নিজেই তাই চন্নদুল থেকে তিনজোড়া 'গ্রেট মোগল' তাস নিয়ে এসেছিল। বাপ্‌রে বাপ্‌, তার জালায় রাত্রে কি ঘুমোবার জো ছিল। এক একদিন রাত দু'টো-তিনটেও বাজিয়ে দিয়েচি তাস পিটে! আর তাসের আড্ডাটি জমত আমাদেরই ঘরে।

বাব্‌লি এইখানে কথা কহিল, বলিল, তোদের ত তা হ'লে খুব কষ্টে কাটত রাত।

নবদুর্গা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া প্রতিবাদ করিতেই যেন বাব্‌লির গা টিপিয়া দিয়া বলিল, কষ্টে কাটলে আর মোটা হলাম কেমন ক'রে রে?

টিয়া হাসিয়া বলিল, ব্যস্‌, এই ত চমৎকার কথা বলতে শিখেচিস্‌ দুর্গা! তা হ'লে তোর মাষ্টারটি ভালই পেয়েচিস্‌ বল্‌, শিক্ষা তোর ভালই হ'চ্ছে তবে?

—হুঁ, তা হ'চ্ছে বইকি!—বলিয়া নবদুর্গা কৌতুক আর চাপিতে না পারিয়াই যেন টিয়ার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল।

টিয়া ও বাব্‌লি নবদুর্গার ভাব দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে চাহিল। টিয়া নবদুর্গাকে দুই হাত দিয়া সাম্‌লাইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিল,—

ভাবে গদ গদ রাই,
(ও তারে) কি পোড়া কথা বা শুধাই!...

মনোহরের মুখের শোনা কথা বলিয়া ফেলিয়া টিয়া খুব খুশী হইতে পারিল না, কিন্তু নবদুর্গা ও বাব্‌লি একেবারে উচ্ছলিত আবেগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে পর টিয়াই আবার বলিল, অত বাজে ব'কে মরচিস্ কেন দুর্গা? সরাসরি আমাদের সরোজবাবুর কথা কিছু শুনিয়ে দিলেই ত আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

বাব্‌লি অমনি বলিল, সত্যি, তার কথা ত একবারও বললি না দুর্গা। প্রথম তোদের কি কথা-বার্ত্তা হ'ল, কেমন ক'রে লজ্জা ভেঙ্গে প্রথম কথা কইলি—সেই সব বল্, তা না যত বাজে কথা।

নবদুর্গা এইবার একটু বিপদেই পড়িল। সেই কথা বলিতেই ত আসা, কিন্তু কেমন করিয়া যে সুরু করা যায় তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না; আর বলিতে চাহিলেই কি সে-সব এত সহজে বলা যায় নাকি, আর গুছাইয়া বলিতে পারাও কি সহজ! নবদুর্গা কাজে কাজেই কেমন যেন একটু লজ্জায় কাতর হইয়া পড়িল। তার-পরে বলিল, বিশেষ তেমন আর কি যে বলব ছাই!

টিয়া মুহূর্ত্তে নবদুর্গার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, দেখি তোর মুখ আমরা ভাল ক'রে—বিশেষ কিছু কিনা তা আমরাই ব'লে দিতে পারব।

তবে ত তোরা জানিস্ সবই।—বলিয়া নবদুর্গা মৃদু একটু হাসিল।

টিয়া বলিল, কেন, আমরা কি সর্ব্বজ্ঞ, না আমরা স্বামীর ঘর করতে গেছি কখনও? সরোজবাবু লোকটি কেমন তাই বল্ না, না, তা বলতেও লজ্জা করে? বাবা! বাবা! আর সাধতে পারি না!

নবদুর্গা সোহাগে গলিয়া গিয়া বলিল, তা লোক বেশ ভালই।

বাব্‌লি নবদুর্গাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাক্, খুব হয়েচে, তোর আর বলতে হবে না কিছু।

টিয়া বলিল, ভারি যে তোর দেমাক লো দুর্গা। যা, আর সাধতে পারি না!

তখন দুর্গা একটা ঢোক্ গিলিয়া যেন আড়ষ্টকণ্ঠে বলিতে লাগিল, প্রথম কথাই ও বললে কি জানিস্? বললে, শুধু দুর্গাতে মানাচ্ছিল না বুঝি, তাই নবদুর্গা নাম রাখা হ'ল? উত্তরে বললাম, শুধু নবদুর্গাতেও আর মানাচ্ছিল না, কাজেই না তোমার খোঁজ হ'ল।

—ব-ল্-লি!—বাব্‌লি এমনভাবে নবদুর্গার কথার পিঠে কথা কহিল যে মনে হইল, নবদুর্গার উত্তরটা সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

নবদুর্গা বলিল, হুঁ, সত্যিই বললাম বই কি। আর ও এমন ঠাঁই যে কথা আপনিই জুগিয়ে যায়, বিশ্বাস না করবার এতে আছে কি?

বাব্‌লি সৌৎসুক্যে বলিল, তারপর?

নবদুর্গা বাব্‌লির 'তারপর' বলার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। টিয়াও সে হাসিতে যোগ দিল।

তারপর নবদুর্গা একাই কত কথা যে বলিয়া চলিল, তাহার আর যেন শেষ নাই। এমন কি, একদিন যে তাহার মেজ ননদ কনকচাঁপার চোখে তাহাদের সামান্য একটা দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল তাহাও বলিতে সে ভুল করিল না। কথা বলিতে বলিতে নবদুর্গার মুখ-চোখ

ঈষৎ রাঙিয়া উঠিয়াছিল, ললাটে ও কপোলে মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছিল।

কথায় কথায় বেলা গড়াইয়া গেল। ঠিক হইল, তিনজনে একত্রে আবার বহুদিন পরে রায়েদের দীঘিতে গা ধুইতে ও কলসী ভরিয়া জল আনিতে যাইবে।

টিয়া একটি পিতলের কলসী, একখানি গামোছা ও একখানি শাড়ী সঙ্গে লইয়া তাহাদের সঙ্গে প্রথম সারকেল-বাড়ী এবং সেখান হইতে নব-দুর্গার বাড়ী গেল। নবদুর্গা প্রস্তুত হইয়া আসিলে তাহার মা ডাকিয়া বলিয়া দিল, বর্ষার জল বাপু, একটু তাড়াতাড়ি যেন গা ডুবিয়ে উঠে আসা হয়।

নানা গাছের নীচ দিয়া সরু একফালি চির-ছায়ায়-ঘেরা গ্রাম্য পথ—নির্জ্জন ও অভিমানিনী প্রিয়ার মত থম্‌থমে—অসমতল ও আঁকা-বাঁকা, সেই পথ ধরিয়াই হাসি-গুঞ্জনে তাহারা রায়েদের দীঘির পানে আগাইয়া চলিল।

নবদুর্গার কাঁধে আজ গামোছার পরিবর্ত্তে একখানি লাল বর্ডার দেওয়া দামী তোয়ালে—এখনও তাহাতেও যেন সুবাসিত তৈলের একটা সুমিষ্ট ঘ্রাণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছে, নবদুর্গার সারা অঙ্গে কেমন যেন একটি ঘুমন্ত সুবাস।

নানাকথার মধ্যে পথ চলিতে চলিতে দীঘির প্রায় কাছে আসিয়া বাব্‌লিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া টিয়ার প্রায় গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া নবদুর্গা বলিল, হাঁরে টিয়া, আসল কথাই তোকে আমি জিগ্যেস্ করতে ভুলে গেচি। সত্যি কথা বলবি ত?

টিয়া অত্যন্ত সহজভাবেই বলিল, কেন বলব না, নিশ্চয় বলব।

—হ্যাঁ রে, রায়েদের দীঘিতে আজকাল বিকেলে নাকি তুই গা-ধোওয়া বন্ধ করেচিস্? খালের জলই নাকি তোর মন ভুলিয়েচে শুনতে পাই? এ কি সত্যি?

টিয়া সহজভাবেই বলিল, হুঁ, তা সত্যি বই কি! খালের জলও ত নতুন জল—বেশ পরিষ্কার। আবার পচতে সুরু করলেই দীঘিতে গা ধোবো। কেন, একথা হঠাৎ?

নবদুর্গা কোনও উত্তর না দিয়া বাব্‌লির গায়ের উপর আসিয়া যেন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আ মরণ তোমার!—বলিয়া বাব্‌লি সরিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে নবদুর্গার হাসির মাত্রা যেন আরও বাড়িয়া গেল। শেষে হাসি থামাইয়া নবদুর্গা বলিল, একথা হঠাৎ কেন? হঠাৎই শুনলাম যে, তাই হঠাৎ বলা।

বাব্‌লি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

টিয়া কিন্তু ইহাতেও অপ্রতিভ হইল না, বলিল, হঠাৎ শুনলেও সত্যি কথাই শুনেচিস্ দুর্গা।

নবদুর্গা বাব্‌লির দিকে চাহিয়া কোনও রকমে হাসি চাপিয়া বলিল, তা মিথ্যে হবে কেন—সে ত আর তোর শত্রু নয়।

ও, শত্রু নয় বুঝি।—বলিয়া টিয়া চুপ করিল, আর সে এবিষয়ে কোনও কথা কহিবে না এমনই ভাবে।

রায়েদের দীঘির শান-বাঁধানো ঘাট মেয়েদের কলকণ্ঠে কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিল। নব-পরিণীতা নবদুর্গাকে ঘিরিয়া যত রঙ্গ পরিহাস বাদানুবাদ সুরু হইয়া গেল। একে একে সেখানে পাড়ার আরও অনেক মেয়ে ও বধূরা আসিয়া জুটিল এবং দীঘির কাকচক্ষু—অধুনা বর্ষার ঘা খাইয়া একটু ঘোলাটে-হইয়া-ওঠা জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কত রঙ্গ-পরিহাসের কথাই না জুড়িয়া দিল। সবারই লক্ষ্যবস্তু নবদুর্গা, কাজেই নবদুর্গা সবার মাঝে পড়িয়া যেন হাঁপ লইতে লাগিল। কিন্তু নব-দুর্গার এসব ভালই লাগিতেছিল; সে যে আবার কোন দিন সবার দৃষ্টি

এমন একান্ত করিয়া আকৃষ্ট করিতে পারিবে তাহা ভাবিতে পারে নাই। টিয়া ও বাব্‌লির কাছে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি তাহাকে করিতে হইল। রায়েদের ছোট তরফের ছোটবাবুর ছোট মেয়ে রেণি—সেটি আবার ফাজিল কম না, সে একসময় নবদুর্গাকে অপ্রতিভ করিয়া তুলিবার জন্য সহসা নবদুর্গার গণ্ডের একস্থানে একটি আঙুলের ডগা সকৌতুক স্পর্শ করাইয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঁরে দুগ্‌গি, এ দাগটা তোর ত আগে ছিল না।

নবদুর্গার মুখ-চোখ একেই পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ রাঙিয়া ছিল, তাহাতে রেণির কথা যেন আরও রঙ্‌ চড়াইয়া দিল।

নবদুর্গা কোনক্রমে রেণির কথার উত্তরে বলিল, তা অত কি আগে লক্ষ্য করেচি, আর নতুন হওয়াও খুব বিচিত্র না। তা তুই যখন বলচিস্‌ তখন হয় ত সত্যিই ছিল না।

সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ইহাতে নবদুর্গা বেশী অপ্রতিভ হইল, না রেণি, তাহা বিচার্য্য বটে!

রায়েদের দীঘির ঘাটে কল-কৌতুক যখন বন্ধ হইল তখন সন্ধ্যা সুনিবিড় হইয়া ঘনাইয়া নামিয়াছে। টিয়া, নবদুর্গা ও বাব্‌লি ক্রমে কাপড় ছাড়িয়া কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। টিয়া অন্ধকার-ঘনানো পথ দিয়া নীরবে চলিতে চলিতে ভাবিতেছিল, আজ না জানি কপালে তাহার কত গাল-মন্দই লেখা আছে। ছোটমা এতক্ষণে নিশ্চয় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া টিয়াকে বিদ্ধ করিবার মত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিল। টিয়া পথে সাথীদের বিদায় দিয়া যখন গৃহে ফিরিল, পা তখন আর তাহার যেন গৃহের দিকে চলিতেছিল না।

টিয়া উঠানে পা দিতেই নিশি সজ্জন প্রথম কহিল, এত দেরি হ'লো যে তোর দীঘির ঘাট থেকে ফিরতে?

টিয়া চকিতে উঠান ও ঘরের দাওয়াগুলির দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া

লইয়া ছোটমা রূপসীকে দেখিতে না পাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আজ নবদুর্গা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে কি না—সেই তারই জন্যে এত দেরি হ'য়ে গেল। তুমি আজ নূপুরগঞ্জের হাটে গিচলে বুঝি? এই ফিরে আসচো?

না, ফিরেচি আমি অনেকক্ষণ। ফিরে দেখি একটা লোকও ঘরে নেই যে এই জিনিসগুলো ঘরে তুলে নেবে। শেষে আমাকেই একটা একটা ক'রে ঘরে তুলতে হ'চ্ছে—এ যেন এক লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী হয়েচে।—বলিয়া নিশি সজ্জন উঠানে জড়ো করা অবশিষ্ট কয়েকটী ঝুনা নারিকেল তুলিতে যাইতেছিল, টিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাজে বাধা দিয়া বলিল, থাক্ বাবা, আমি যখন এসেই পড়েচি তখন আর তোমাকে কষ্ট ক'রে ওগুলো তুলতে হবে না।

নিশি সজ্জন কার্য্য হইতে বিরত হইল। তারপরে টিয়ার আর একটু কাছে আগাইয়া আসিয়া আস্তে করিয়া বলিল, তোর ছোটমা'র কি জ্বর হয়েছে নাকি টিয়া?

কই, আমি ত জানি না।—বলিয়া টিয়া রান্নাঘরের দিকে জলের কলসী লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নিশি সজ্জন আবার কি মনে করিয়া যেন বলিল, ভাল কথা টিয়া, আজ নূপুরগঞ্জের হাটে মনোহরের সঙ্গে দেখা হ'লো। সে বললে, বকফুলীর ওপারে ধবলীর কুণ্ডুদের বাড়ী তারা পালা গাইতে এসেচে। কাল সময় পেলে সে এসে দেখা ক'রে যাবে'খন।

টিয়া কথাটা শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র খুশী হইতে না পারিয়া নিজের কাজেই চলিয়া গেল। কারণ, ছোটমা'র যখন জ্বর তখন সাতদিন সাতরাত্রি ত সে আর কোন কাজেই হাত দিবে না, আর সুস্থ থাকিলেই বা কি—টিয়াকেই গৃহের প্রায় সমস্ত কাজ করিতে হয়। উনন তখনও ধরে নাই—রাত্রের রান্না ত পড়িয়াই আছে।

টিয়া জলের কলসী রান্নাঘরে নামাইয়া রাখিয়া উঠানের নারিকেলগুলি যথাস্থানে—অর্থাৎ উত্তরের ঘরের 'কারে' তুলিয়া রাখিয়া উনন ধরাইতে গেল। উনন ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিয়া ছোটমা'র শয্যার পাশে গিয়া বসিতেই রূপসী যেন খেপিয়া উঠিল। অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রূপসী বলিল, আমি বলে কি-না জ্বরের তাড়সে ম'রে যাচ্ছি, আর এই সোমত্ত মেয়ের কি-না রাত দশটা বাজিয়ে দীঘির ঘাট থেকে আড্ডা ভেঙ্গে ফেরা হ'লো!

টিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ঘাটে যাওয়ার আগেও তোমাকে ভাল দেখে গেলাম—কই, তাড়াতাড়ি ফেরার কথাও কিছু ব'লে দিলে না। আমি ত আর গুণতে জানি না যে—

অ, গুণতে জানো না বুঝি!—বলিয়া রূপসী অতি কঠিন শ্লেষ করিল; তারপরে বলিল, কিন্তু গুণতে জানো ব'লেই ত পেত্যয় লাগে, নইলে এ ক'দিন ত খালের ঘাটেই গা ধু'তে যাওয়া হচ্ছিল, আজ আবার দীঘির ঘাটে যাওয়া হ'লো কেন? দত্ত-বাড়ীর ছেলে আজ নূপুরগঞ্জের হাটে গেচে, ফিরতে তার রাত হবে—সে সব ত গুণতে পারো দেখচি।

টিয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—রাগে, না দুঃখে, সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। দত্ত-বাড়ীর সুন্দর যে আজ হাটে গেছে তাহা ত তাহার জানা ছিল না, আর ছোটমা'ই বা সে-খবর জানিল কেমন করিয়া? তবে একটা কথা তাহার মনে হইল, হইতে পারে তাহার পিতার সহিত সুন্দরের হাটে সাক্ষাৎ হইয়াছে, কথায় কথায় সে হয় ত ছোটমা'র কাছে সেকথা বলিয়াছে। কিন্তু সে একবারও ভাবিতে পারিল না যে, রূপসী অপরাহ্নে খালের ঘাটে গিয়াছিল নিজের কাজে এবং সুন্দর ও গঙ্গাকে সে নৌকায় উঠিতে দেখিয়াছিল, আর নৌকা ছাড়ার কালে সুন্দরের মা পূর্ণলক্ষ্মীকে পাড়ে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া বলিতেও শুনিয়াছিল, নূপুরগঞ্জের

ঘাটে যাচ্ছিস্ যা, কিন্তু ফিরতে যেন রাত বেশী হয় না। তাড়াতাড়ি ক'রে ফিরিস্ কিন্তু সুন্দর।

সে যাহাই হউক, রূপসীর এই কঠিন ইঙ্গিতে—আর ইঙ্গিতই বা বলি কেমন করিয়া, ইহা ত স্পষ্ট করিয়াই বলা, টিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তবু টিয়া নিজেকে অতিকষ্টে সংযত রাখিয়া বলিল, নবদুর্গা আর বাব্‌লি এসেছিল ব'লেই রায়েদের দীঘিতে গেলাম গা ধু'তে, নইলে খালের ঘাটেই যেতাম।

রূপসী অপাঙ্গে একবার টিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং আর কোনও কথা বলার প্রয়োজন সে অনুভব করিল না।

টিয়া কিছুক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আবার বলিল, তোমার জন্যে কি পথ্যি হবে জানতে পেলে পরে ছোটমা—

রূপসী সহসা শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, পথ্যি হবে মানে ? আমাকে পথ্যি করাবার জন্যে এত কিসের গরজ তোদের শুনি ? আমার হয়েছেটা কি ? দুপুরে আজ ঘুমুতে পারিনি ত তোদের তিনজনার দাওয়ায় ব'সে গজর্ গজর্ করাতেই, আর তারই ফলে সন্ধ্যে হ'তে-না-হ'তেই ধরেচে মাথা। আমাকে পথ্যি করাতে পারলেই যেন তোদের সবার মনের সাধ মেটে ?

বলিয়া রূপসী অদ্ভুত একপ্রকার মুখভঙ্গী করিল—যেন নিজের অদৃষ্টকেই সে ক্ষোভে মুখ ভেংচাইল।

টিয়ার বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। ছোটমা'র প্রকৃতি আজিও সে সম্যক্ চিনিয়া উঠিতে পারে নাই, কখন যে কোন্ বিচিত্র পথে তাহার মনের ধারা বহিতে থাকে তাহা সে যেন নিজেও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, অপরের ত কথাই নাই।

টিয়া আর একটা কথাও না বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। মানুষের

চরিত্র যে কত বিচিত্র ও হীন হইতে পারে তাহা যেন সে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল।

ওপারের ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া টিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। কিন্তু লজ্জায় মরিয়া যাওয়ার মত এমন কিছু কাণ্ড আর সুন্দর করে নাই। দত্ত-বাড়ীর ঘাটে বাঁধা নৌকার গোলুইয়ের উপর বসিয়া সুন্দর একটা পিতলের দাঁড়ে শিকল দিয়া বাঁধা টিয়াপাখীটিকে খালের জলে স্নান করাইতেছিল। টিয়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া নিজেদের ঘাটে দাঁড়াইয়া মুখে কাপড় তুলিয়া দিয়া সলজ্জ চাপা হাসি হাসিতে লাগিল। সুন্দরের সেদিকে সহজেই দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু দৃষ্টি যে পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে না দেওয়ার ভান করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। তবে পাখীটিকে স্নান করানোর ঘটা কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গেল।

টিয়া ঘাটে আসিয়াছিল সামান্য গোটা দুই বাসন লইয়া, তাড়াতাড়ি সেগুলিকে মাজিয়া ধুইয়া লইয়া সে উঠিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পাখীটার অস্বাভাবিক চীৎকারে আবার সে ফিরিয়া চাহিল। টিয়া ফিরিয়া চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহা উপভোগ্য হইলেও করুণ। পাখীটি সুন্দরের বাঁ-হাতের একটা আঙুল যেন আক্রোশে কামড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর সুন্দর সেই আঙুলটা ছাড়াইয়া লওয়ার জন্য যেন প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। টিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল; কাজেই সুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, পাখীটাকে জলে চুবিয়ে ধরো—শীগ্‌গির, নইলে কি ছাড়ানো সহজ।

সুন্দর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দাঁড়-সমেত পাখীটিকে জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিল এবং কেমন একপ্রকার লজ্জায় সে না হাসিয়াও থাকিতে পারিল না। টিয়ার বুদ্ধি কাজে লাগিল। পাখীটি আত্মরক্ষার্থ সুন্দরের আঙুল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। সুন্দর পরমুহূর্ত্তেই আবার ক্ষিপ্রতার

সঙ্গে দাঁড়-সমেত পাখীটিকে নৌকার উপরে তুলিল। টিয়া তখন রহস্য-কৌতুকে মুখ চাপিয়া হাসিতেছিল। সুন্দর তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিল, তা শত্তুরের সর্ব্বনাশ হ'তে দেখলে কেই বা না খুশী হয়।

হুঁ, তা খুশী ত হয়েচি। আর কেনই বা খুশী হবো না শুনি? আমাকে যারা ঠাট্টা করবে—তা সে শত্রুই হোক, আর মিত্রই হোক্—তাদের দুঃখে আমি খুশী হবোই, একশোবার হবো।—বলিয়া বিজয়গর্ব্বে টিয়া মাটিতে পা ফেলিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া গেল।

বাতাবি লেবু গাছটার কাছ বরাবর আসিতেই তাহার নজরে পড়িল মনোহর—সে ঘাটের দিকেই আসিতেছে। টিয়া আর মুহূর্ত্তমাত্রও সেখানে দাঁড়াইল না, বাড়ীর দিকে হাঁটিয়া চলিল। মাথা সে নীচু করিয়াই অগ্রসর হইতেছিল। মনোহরের অতি নিকটে আসিয়াও সে মাথা তুলিয়া চাহিল না, মনোহর ইহাতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, সকালবেলা আমার মুখ দেখাও কি পাপ নাকি টিয়াপাখী? একেবারে মাথা গুঁজে যে চলেছো? এমন কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে শুনি?

টিয়া থমকিয়া পথের মাঝেই দাঁড়াইয়া গেল।

মনোহর টিয়াকে নীরব দেখিয়া আবার বলিল, আমি যে আজ আসবো তা নিশ্চয় জানতে? কাল নূপুরগঞ্জের হাটে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁকে সে কথা ত ব'লে দিয়েছিলাম, বলেন নি বুঝি কিছুই?

টিয়া বলিল, হু, তা বলেচেন বই কি! ধবলীর কুণ্ডুদের বাড়ী পালা গাইতে এসেছিলে বুঝি?

মনোহর ভারি খুশী হইল। টিয়া ত তবে তাহার সকল খবরই রাখে। কাজেই মনোহর বলিল, কাল রাত্তিরে যাত্রা গেয়ে রাত থাকতেই রওনা হ'য়ে পড়েছি এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আরও

আগে এসে পৌঁছুতে পারতাম, কিন্তু বকফুলী পার হওয়ার জন্যে সুবিধে মত নৌকা পাওয়া গেল না, শেষে তিন আনা পয়সা খরচ ক'রেই পার হ'তে হ'লো ; আর একটু দেরি করলে অবশ্য তাও লাগতো না। তা তিন আনা পয়সা এমন কিছু বেশীও আর না।

টিয়া এইবার একটু রূঢ় হইয়া কহিল, তা নাই বা হ'লো, তিন আনার পয়সাই বা খামোকা খরচ করতে গেলে কেন ?

মনোহরও ইহাতে রূঢ় না হইয়া পারিল না, বলিল, আমার পয়সা আমি খরচ করবো তাতে কার কি বলার আছে ? বেশ করেচি।

টিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। হাসিয়াই টিয়া পথ ছাড়িয়া ঘাসের জমির উপর দিয়া মনোহরকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। মনোহর অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একটা কথা আমার শুনে যাও টিয়া।

মনোহরের ভারি কণ্ঠ টিয়াকে চম্‌কাইয়া দিল, সে দাঁড়াইয়া গেল। মনোহর দুই পা অগ্রসর হইয়া টিয়ার মুখের প্রতি গভীর দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, এই যে আমার আসা-যাওয়া এ তোমার একেবারেই পছন্দ হয় না—তাই নাকি টিয়া ? আমাকে তুমি দেখতে পারো না, না ? কিন্তু আমি এমন কি অন্যায় করেচি শুনতে পাই না কি ?

টিয়া ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিল, না, তুমি কেন আবার অন্যায় করতে যাবে শুনি ? আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই আমার ব্যবহারে কেউ খুশী হয় না। নইলে, এত খেটেও ত ছোটমা'র মন যোগাতে পারি না।

মনোহর সুযোগ পাইয়া বলিল, সে আমি জানি। আর দিদি ত চিরকালই এম্‌নি—তার মন যোগাতে পারে এমন মানুষ বোধ করি পৃথিবীতে আজও জন্মায় নি। বাবার মত ভালমানুষই দিদিকে সহ্য করতে পারতেন না, তা অন্যের ত কথাই নেই। দিদির বিয়ের পরে বাবা তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—যাক্, এতদিনে পাপ বিদেয় হ'লো। দিদির গুণের আর বাট নেই। সত্যি কথা বলতে কি টিয়া, দিদির সঙ্গে

দেখা করতে আমি শিখীপুচ্ছে আসি না কোনদিনই···তা তোমার যদি পছন্দ না হয় ত আর সত্যিই আসবো না।

টিয়া লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, আসবে না কেন, নিশ্চয় আসবে। তোমার আসা-যাওয়া যে আমি পছন্দ করিনে এ খবর কি তোমার কাছে বাতাসে পৌছেচে ?

বলিয়া হাসিয়া ফেলিয়া টিয়া ত্রস্তে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। মনোহর খুশী হইয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল ভাল করিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া আসিতে।

টিয়া সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া মনোহরকে খুশী করিতে গিয়া কত বড় বিপদ যে সেই সঙ্গে ডাকিয়া আনিল তাহা বুঝিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। টিয়া মনোহরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। মনোহর কিন্তু টিয়াকে রান্নাঘরে স্বস্তিতে রান্নার কাজে ব্যাপৃত থাকিতে দিল না, অবিলম্বে ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দাঁড়াইয়া দুই-একটা অবান্তর কথা তুলিল এবং পরমুহূর্ত্তেই রান্নাঘরের বেড়ার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা পিঁড়িগুলির মধ্য হইতে একখানি পিঁড়ি মেঝেয় পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, এককালে শিখীপুচ্ছের রায়েদের বাড়ীতে নাকি খুব যাত্রা-গান হ'তো শুনেচি, আর সেকথা মিথ্যেও নয়, কারণ অধিকারী ম'শায়ের মুখেই সেকথা আমার শোনা। এখন কই, সে সব আর হয় না। হ'লে পরে বেশ হ'তো কিন্তু টিয়া, তা হ'লে আমি তোমাকে আমাদের দলের যাত্রা শোনাতে পারতাম। আর তা'হলে বুঝতে পারতে যে আমি বড়-একটা সামান্য লোক নই। আজকাল দলের মধ্যে য়্যাক্টিং-এ আমি সেকেণ্ড্ যাচ্ছি, শালুকখালির কেশব চৌধুরীকে কিছুতেই আর এঁটে ওঠা গেল না, ও লোকটা যেন একটা বর্ন্-য়্যাক্টর, আর কি খাসা

গলাখানা! তেম্‌নি আবার তাঁর চেহারা! সভার মধ্যে এসে যখন—'সখে বাসুদেব!' ব'লে দাঁড়ায়—তখন সাধ্য আছে কি কোন লোকের যে কান না খাড়া ক'রে থাকে! হ্যাঁ, ও-লোকটার কাছে হার স্বীকার ক'রেও আনন্দ আছে। হ্যাঁ, য়্যাক্টর যদি বলি ত—কেশবদা' আমাদের একজন য়্যাক্টর বটে!

কেশব চৌধুরীর অভিনয় যত চমৎকারই হউক না কেন, টিয়া মনোহরের কথায় কোন চমৎকারিত্ব খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু মনোহরকে সেখান হইতে কি উপায়ে যে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিদায় লইতে বলা যায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার ভয় হইতেছিল ছোটমা'র জন্য, কেন না এখানে আসিয়া এমন কিছু কঠিন কথাই হয় ত বলিয়া ফেলিবে যে, তাহারই চোট্ সাম্‌লাইয়া উঠিতে টিয়ার সারাদিন কাটিয়া যাইবে। কারণ, রূপসীর এবম্বিধ হঠকারিতা ও বুদ্ধিবৃত্তির নিকৃষ্টতার বহু প্রমাণই সে এ যাবৎ পাইয়াছে।

টিয়া তাই বলিয়া ফেলিল, এখন তুমি উঠে গিয়ে ছোটমা'র ঘরে একটু ব'সো। আমার কাজ-কম্‌মো সারা হ'লে পর তোমার কাছে তোমাদের যাত্রার গল্প শুনবো'খন। কাজের সময় গল্প করছি দেখলে ছোটমা হয় ত চটবেন আবার!

মনোহর ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং দিদির বুদ্ধিবৃত্তির একটু নিন্দা করার সুযোগ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। বলিল, হ্যাঁ, দিদি আবার চটবেন, আর তা আবার নাকি লোককে গ্রাহ্য ক'রেও চলতে হবে! পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী! দিদি ত অষ্টপ্রহর চ'টেই আছেন, একটা লোককেও যদি দুনিয়ায় দেখতে পারলেন। অমন স্বার্থপর আর কাণ্ডজ্ঞান-হীন যে মানুষ আবার হয় কেমন ক'রে—তা ত আমি ভেবে পাই না।

টিয়া মনোহরকে তাড়াতাড়ি থামাইবার জন্য বলিল, তুমিও ত খুব লোক যা-হোক্ মনোহরমামা। তাঁরই বাড়ীতে ব'সে তাঁরই নিন্দে করছো।

নিন্দে আবার কি রকম? যা সত্যি তাই ত আমি বলচি। বলিয়া মনোহর একটু হাসিতে চেষ্টা পাইল। যাক্ এখন সে সব কথা, আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারো টিয়া, কাল সারারাত জেগে পালা গেয়ে গলাটা আমার কেমন একটু ড্যামেজ হয়েচে, চা না হ'লে আর চলছে না যে।

চা? চা'র কোন আয়োজনই ত এ বাড়ীতে নেই। আচ্ছা, তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি বাব্‌লিদের বাড়ী থেকে চারটি চা চেয়ে-চিন্তে পাই কোন রকমে। তা হ'লেই এক খাওয়াতে পারবো, নইলে হবে না।—বলিয়া টিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাব্‌লিদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার মুখে বলিয়া গেল, তুমি ততক্ষণ ছোটমা'র ঘরে গিয়ে গল্প করো, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি তোমাকে চা ক'রে খাওয়াতে পারি কি না।

টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোহরও রান্নাঘর হইতে বাহির হইল।

বাব্‌লিদের বাড়ী হইতে টিয়া চা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মনোহরকে চা দিলে পর মনোহর বলিল, থ্যাঙ্কিউ!

কথাটা ইংরেজী হইলেও এবং মনোহরের উচ্চারণে যথেষ্ট ত্রুটি থাকিলেও টিয়া অর্থগ্রহণে সক্ষম হইল, আর রূপসীর সম্মুখে তাহা হওয়াই নিজেকে কেমন যেন সে বিপন্ন মনে করিল। মানুষ যে কতদূর বিরক্তিকর হইতে পারে তাহা মনোহরকে না দেখিলে টিয়া কোনদিনই অনুভব করিতে পারিত না। কি প্রয়োজন ছিল তাহার এই বিজাতীয় ভাষা প্রয়োগের, আর কথা বলারই বা তাহার হইয়াছিল কি; সে ত নীরবে গ্রহণ করিলেই টিয়া নিজের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতে পারিত। টিয়ার কেমন যেন ইহাতে লজ্জা করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে ছোটমা'র কাছে এই কথারই ঠার যে কত শুনিতে হইবে তাহা সে এখনই ধারণা করিতে পারিল।

সমস্ত মধ্যাহ্ন টিয়ার মহা অস্বস্তিতে কাটিল।

অপরাহ্নে নবদুর্গা একবার দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার

বিশেষ কাজ থাকায় সেও বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারে নাই। নবদুর্গা যখন উঠানের একপাশে টিয়াকে ডাকিয়া লইয়া কথা কহিল, তখন মনোহর উত্তরের ঘরের দাওয়ায় একটু গড়াইয়া লইতেছিল, আর রূপসী তাহারই পাশে বসিয়া কি যেন সব অবান্তর কথা-বার্ত্তা বলিয়া চলিয়াছিল।

নবদুর্গা চলিয়া গেলে পর টিয়া কাজ করিতে চলিয়া গেল। ঘরের কাজ সারিয়া রায়েদের দীঘি হইতে দুই কলস জল আনিয়া রান্নাঘরে রাখিয়া একখানি শাড়ী ও গামোছা কাঁধে ফেলিয়া খালের ঘাটে সে গা ধুইতে গেল। বেলা তখন একেবারেই পড়িয়া গেছে, সন্ধ্যার গাঢ়তম বেদনা ঘনাইয়া আসার আর যেন বিলম্ব নাই।

ওপারের ঘাটে কোন নৌকা ছিল না—ইহা যেন সুন্দরের বাড়ী না থাকার নিশানা। টিয়া নিশ্চিন্তমনে খালের জলে নামিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গামোছা দিয়া গা মাজিল, তারপরে ঘাটের গাবের খাটিয়াটার উপর উঠিয়া বসিয়া জলে পা ঝুলাইয়া রাখিয়া মুখে জল লইয়া কুলি করিতে করিতে সকালে-দেখা সুন্দরের কাণ্ডটার কথাই সে ভাবিতেছিল। সুন্দর তাহাকে জব্দ করিবার জন্য খামোকা একটা টিয়াপাখী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। টিয়াপাখীটি যে সুন্দরের আঙুল কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে ভারি জব্দ করিয়া ছাড়িয়াছে তাহা মনে করিয়া টিয়া মনে মনে হাসিল। কে জানে, সুন্দরের আঙুলে আবার কিছু হয় নাই ত! সুন্দরের আঙুলের জন্য টিয়ার কেন জানি ভাবনা ধরিল। আবার একথাও সে ভাবিল, বেশ হইয়াছে, যেমন তাহাকে জব্দ করিতে যাওয়া সুন্দরের! এইবার নিজেই সে জব্দ হইয়া গেছে!

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া নামিতেই টিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া গা মুছিয়া কাপড় পাল্টাইল এবং ভিজা কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া নিংড়াইয়া লইল। তারপরে সহজ গতিতে উপরে উঠিয়াই সে চমকাইয়া গেল। মনোহর নীরবে বাতাবি লেবু গাছটার একটি ডাল ধরিয়া পথের পরেই দাঁড়াইয়া

আছে। কে জানে—এমন সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। টিয়ার সারা দেহে তখন ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ শিহরণ খেলিতেছিল, কাজেই একটা কথাও সে বলিতে পারিল না। আর যত রূঢ় করিয়া প্রথম বাক্যটি প্রয়োগ করা এক্ষেত্রে প্রয়োজন বলিয়া সে মনে করিতেছিল, ঠিক ততখানি রূঢ়তার সন্ধান নিজের মধ্যে সে পাইল না। ফলে তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতেই হইল।

মনোহর বিকৃত একটু হাসিয়া বলিল, আমাকে তুমি যত খারাপ ভাবচো টিয়া, তত খারাপ আমি সত্যিই নই। আজ আমি সেই কথাই শুনতে এসেচি, তোমাকে বলতে হবে—কেন তুমি আমাকে দেখতে পারো না। সমস্ত দিনে সেকথা জিগ্যেস্ করবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি, তাই তোমার খোঁজে এখানে আসতে আমি বাধ্য হয়েচি। কাল ভোরেই আবার আমাকে চ'লে যেতে হবে। তার আগে আমি শুনতে চাই, কেন তুমি আমাকে দেখতে পারো না?

টিয়া তখনও চুপ করিয়া রহিল।

মনোহর আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, কি, বলবে না টিয়া? দিদির জন্য কি আমিও তোমার চোখে চিরদিন বিষ হ'য়ে থাকবো?

টিয়া তথাপি নীরব রহিল।

মনোহর আবার বলিল, আমি যাত্রার দলের ছেলে হ'তে পারি টিয়া, কিন্তু এই যে এতদিন আসি-যাই কখনও কি কোন খারাপ ব্যবহার করেচি তোমাদের কারও সঙ্গে? তবে তুমি আমাকে কেন দেখতে পারবে না? আমাকে যে কত কষ্ট স্বীকার ক'রে দল ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় শিখীপুচ্ছে, তা বললে কি তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে? আর আসি ত সে শুধু তুমি এখানে আছ ব'লেই, নইলে দিদির জন্যে ভারি আমার মাথা ব্যথা! ওর মুখ দেখাও আমি পাপ মনে করি টিয়া। আর এ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তুমি যদি এ না চাও ত আমি চাই না

এখানে এসে তোমাকে এভাবে বিরক্ত করতে। তুমি যদি আসতে বারণ করো ত সত্যি আর কখনও আমি আসবো না।

টিয়া মনোহরের কণ্ঠের আর্দ্রতায় কেমন একটু বিচলিত হইয়া বলিল, সে কি কথা, তুমি আসবে না কেন, নিশ্চয় আসবে। তুমি ত আর আমার শত্রু নও যে তোমাকে আমি দেখতে পারি না। আর আমি কেন তোমাকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ ক'রে দেব শুনি? তা যদি কেউ পারে ত ছোটমা'ই একমাত্র পারেন। চাই কি আমাকেও একদিন প্রয়োজন হ'লে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

মনোহর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই বলিল, সে আমি ভাল ক'রেই জানি টিয়া। আর সেই কারণেই দিদিকে আমি আরও সহ্য করতে পারি না। তোমার মত মেয়েকেও যে ভালবাসতে পারেনি সে যে কত বড় পাবণ্ড তা আমি বহুপূর্ব্বেই ঠিক ক'রে ফেলেছি।

মনোহর টিয়ার আরও নিকট হইয়া দাঁড়াইল, টিয়া মনোহরের এতখানি ঘনিষ্ঠতায় নিজেকে বিশেষ বিব্রত মনে করিল। কিন্তু মনোহরকে আপনার সামান্য রূঢ়তার দ্বারাও আজ আর কিছুতেই যে সে আঘাত দিতে পারিবে না তাহা সে সহজেই বুঝিল। নিজের কাছে নিজেকে আজ তাহার ভারি দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। তাই সে সেখান হইতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাতেই যেন বলিল, ওদিকে আবার সন্ধ্যে উত্‌রে গেল, তুলসীতলায় সন্ধ্যে-পিদিম দেওয়া হ'লো না, ছোটমা'র একবার সেদিকে খেয়াল হ'লেই হয়—আমার আর রক্ষে থাকবে না। আর ভাল কথা, এবেলা চা খাবে কি, তা'হলে না হয় ক'রে দি একটু জল ফুটিয়ে।

মনোহর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, চা ত আমার দু'বেলা খাওয়াই অভ্যেস্, কিন্তু বলি না পাছে তোমার আবার কষ্ট হয় টিয়া। আর তোমাদের এখানে যে চায়ের কোন ব্যবস্থাই নেই কিনা। না, থাক্, আমার জন্যে আর তোমার অনর্থক কষ্ট ক'রে লাভ নেই।

না, না, কষ্ট আবার কি!—বলিয়া টিয়া মনোহরের পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, মনোহর কি মনে করিয়া টিয়ার পিছন হইতে টিয়ার কাঁধে ঝুলানো গামোছাটার প্রান্তভাগ ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলিল, আপত্তি না থাকলে গাম্‌ছাটা তোমার নিলাম টিয়া, ঘাট থেকে একটু ঘুরে আসি।

টিয়া একটু চম্‌কাইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মুহূর্তেই আবার নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, না, আপত্তি আবার কিসের! কিন্তু ঘাট থেকে একটু চট্‌ ক'রে ফিরো, আমি সন্ধ্যে-পিদিম দিয়েই কিন্তু বাঁশপাতা ধরিয়ে তোমার চায়ের জল চাপিয়ে দেব।

মনোহর টিয়ার গামোছাটা নিজের কাঁধে ফেলিয়া বলিল, দেরি হবে না নিশ্চয়ই। বাঃ, তোমার গাম্‌ছাটায় ত ভারি চমৎকার মিঠে গন্ধ টিয়া! সুগন্ধি তেল মেখেছিলে নিশ্চয়?

টিয়া লজ্জায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি কি মেখেছি ছাই, নবদুর্গা জোর ক'রে মাথায় ঢেলে দিলে তাই। আমার আবার অত সখ থাকলেই ত হয়েছিল!

মনোহর অমনি বলিল, বাঃ, সখ তোমার থাকবে নাই বা কেন? এখন সখ থাকবে না ত—থাকবে আবার কবে শুনি? এবার যেদিন আসবো—তোমার জন্যে একশিশি সুগন্ধি তেল কিনে আনবো। 'চম্পাল্‌'-এর নাম শুনেচো নিশ্চয়—তাই একশিশি নিয়ে আসবো।

টিয়া আর সেখানে দাঁড়াইল না, মনোহরও ঘাটে নামিয়া গেল।

মনোহরের বেশীদিন কোথাও থাকিবার উপায় নাই। কাজেই তাহাকে পরদিন ভোরেই চলিয়া যাইতে হইল। এবার সে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়াই গেল।

মনোহর চলিয়া গেলে টিয়া একটা নিবিড় স্বস্তিঘন নিশ্বাস ফেলিয়া

পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসনের পাঁজা লইয়া খালের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু বেশীদূর আর তাহাকে স্বচ্ছন্দ সহজগতিতে অগ্রসর হইতে হইল না। বাগানের পথে পা দিয়াই গতি তাহার কেমন বিব্রত ও সলাজ্জ হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তেই গতি তাহার একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে পথের মাঝেই তাই দাঁড়াইয়া গেল—নীরব, নিথর নিস্পন্দ।

সুন্দরের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু সুন্দর পথের পাশের কাঁটাল গাছটার নীচে সত্যই দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে কি যে তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা টিয়া সত্যই ভাবিয়া পাইল না। সুন্দরকে এত কাছে পাওয়া টিয়ার পক্ষে অতি বড় ভাগ্যের কথা, কিন্তু ভাগ্য যদি বা আজ সুপ্রসন্ন হইল ত টিয়া এত ভয় পাইতেছে কেন? সুন্দরকে এত নিকটে দেখিয়া টিয়ার ভয় পাওয়ার কথা না, কিন্তু বুক তাহার কেমন যেন দুর্ব্বলতায় কাঁপিয়া উঠিল। টিয়ার মুখ-চোখ পাংশু হইয়া আসিল। সুন্দর কি তবে পূর্ব্বপুরুষের শত্রুতা একেবারেই ভুলিয়া গেল? দুইবাড়ীর রক্তে যে সে-অতীতের শত্রুতার বিষ এখনও জড়ানো আছে তাহা কি তাহার একেবারেই খেয়াল নাই? সামান্য সংঘর্ষে যে আবার কলঙ্কিনীর খালে বিষাক্ত রক্ত নাচিয়া উঠিতে পারে, তাহা কি সে একবার ভাবিয়া দেখে নাই?

কিন্তু টিয়া কেন জানি ইহাতে খুশী না হইয়াও পারিল না। টিয়া কি কোনদিন আবার ভাবিতে পারিয়াছে যে, সে সুন্দরকে সমস্ত অতীত নিশ্চিহ্ন করিয়া ভুলাইয়া দিয়া এপারে টানিয়া আনিতে পারিবে। যে জীবনে কখনও এপারে ভুলেও পা ছোঁয়ায় নাই, সে ত আজ টিয়ার মায়াতেই এপারে পা বাড়াইয়াছে। গর্ব্বোল্লাসে টিয়া একেবারে নিস্তরঙ্গ হইয়া গেল।

সুন্দর টিয়াকে দেখিয়া ম্লান একটু হাসিল এবং লজ্জাকাতরকণ্ঠেই বলিল, টিয়ার মায়াতেই আমাকে এপারে আসতে হ'লো, আমাকে

একেবারে দৌড় করিয়ে মারলে। শেষ পর্য্যন্ত উড়ে এসে বসেচে তোমাদের এই কাঁটালগাছের শিক-ডালে।

টিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিচলিত হইল, তারপরেই নিজেকে সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, টিয়াপাখীটা উড়ে এসেছে বুঝি? বা, দাঁড়ের শেকল কেটে পালালো কেমন ক'রে?

সুন্দর বলিল, পায়ে ওর পাছে লাগে তাই শেকলের আংটাটা একটু আল্‌গা ক'রে রেখেছিলাম, ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে খুলেই পালিয়েছে বোধ করি। কি মুস্কিলেই সে পড়া গেছে!

টিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, বনের পাখী ত পালাবেই। মিছে ওর পেছনে ছোটা, আর ও কি ধরা দেবে নাকি! এবার আর একটা টিয়া এনে পোষো, টিয়ার মায়াতেই যখন পড়েছো।

হ্যাঁ, মায়া না!—বলিয়া সুন্দর উর্দ্ধে গাছের দিকে দৃষ্টি ফেলিতেই দেখিল, টিয়াপাখীটি সহসা সেখান হইতে অন্যত্র উড়িয়া চলিল। এবার আর সজ্জন-বাড়ীর বাগানের কোন গাছেই বসিল না, বহুদূরে উড়িয়া গেল। সুন্দর হতাশ হইয়া বলিল, এপারে আমাকে এনে তবে ছাড়লে, কিন্তু ধরাও ত দেবার মতলব কিছু দেখি না। লজ্জা-অপমানই বোধ হয় ভাগ্যের লেখা!

টিয়া সুন্দরের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, সত্যিই ত, উড়ে পালালো যে! পালিয়েছে, বেশ হয়েছে, আমি খুশীই হয়েছি, যেমন আমাকে খানোকা জব্দ করার জন্য টিয়া কেনা। নূপুরগঞ্জের হাট থেকে টিয়া কিনে এনে যেমন আমাকে জব্দ করতে চাওয়া, বেশ হয়েচে, আমি ধম্‌মো দেখেছি।···আহা! সত্যিই যে উড়ে গেল! বেশ ছিল কিন্তু দেখতে পাখীটা। বনপলাশীর ভৈরব দত্তের ছেলের না হ'য়ে যদি আর কারও ও-পাখী হ'তো ত আমি প্রথম দিনই ঠিক চেয়ে বসতাম। আমার বেশ লেগেছিল সত্যি তোমার ঐ পাখীটা।

সুন্দর এতক্ষণে দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, এটা যে শিখীপুচ্ছের নিশি সজ্জনের মেয়ের মত কথা হয়েচে তা'তে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা তোমার মনের কথা হ'লোনা টিয়া।

টিয়া বলিল, না, মনের কথা হ'লো না, আমার মন জানি আবার কি! আমার মন যেন তোমার দুয়োরে বাঁধা রেখেছি, তুমি তার সব খবর জানো! কিন্তু আমার মনের খবর না রেখে, বাবার মনের খবর রাখলে নিজের ভাল হ'তো। বাবা যদি একবার দেখতেন যে ভৈরব দত্তের ছেলে তাঁর ভিটের মাটিতে পা ঠেকিয়েচে—তা হ'লে এতক্ষণে মহাপ্রলয় হ'য়ে যেত। তোমার টিয়া এখানে আছে ব'লে নিশ্চয়ই তাঁর হাত থেকে পার পেতে না।

সুন্দর হাসির মাত্রা সামান্য আর একটু চড়াইয়া বলিল, তা পার না পেতে পারতাম, কিন্তু সত্যি কথাই বলা হ'তো ত।

টিয়া সুন্দর করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। কারণ, ইহার পরে আর কি যে কথা বলিয়া সুন্দরকে সেখানে আরও কিছুক্ষণের জন্য আটকাইয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের আলাপের পথটা অধিকতর প্রশস্ত এবং সহজ নির্ব্বাধায় চলমান করিয়া তোলা যায় তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখনও সে সুন্দরের সঙ্গে আলাপে নিজেকে ঠিক বাধামুক্ত মনে করিতে পারিতেছিল না। আজিকার এই ক্ষণিকের কৌতুক-পরিহাস-বিজড়িত আলাপের পরেও ভবিষ্যতে হয় ত সামান্য কথার আদান-প্রদানেও উভয়ের মধ্যে আসিয়া যাইবে পূর্ব্বেকার অনালাপী দিবসের কঠিন জড়তা। সেই ভয়েই আরও সে ভাষা বন্ধ করিয়া প্রাণের সমস্ত আনন্দ ও অভ্যর্থনা ঐকান্তিকভাবে হাসির ভিতর ঢালিয়া দিয়া সুন্দরকে নিকটতম করিয়া তোলার প্রয়াস পাইল।

কিন্তু টিয়ার পিছনে দাঁড়াইয়া সেই সঙ্গেই প্রায় যে হাসিয়া উঠিল সে টিয়ার অদৃষ্ট নয়—টিয়ার ছোটমা—রূপসী। আর হাসি তাহার মনে মনে হইলেও কথা ছিল, একেবারে চরম।

সুন্দর পূর্ব্বেই চমকাইয়াছিল অদূরে রূপসীর আবির্ভাবে এবং টিয়াও চম্‌কাইল রূপসীর হাসি শুনিয়া। সে হাসি শুনিয়া টিয়ার হাত হইতে বাসনের পাঁজা খসিয়া পড়িলেই হয়ত তাহার মনোভাবের যথার্থ পরিচয় পাওয়া হইত; কিন্তু পড়িতে সে দেয় নাই, যেহেতু সুন্দরের কাছে নিজেকে সে অতখানি দুর্ব্বল বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারে নাই।

রূপসী হাসিয়া থামিলেই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বাড়াবাড়ি দোষে দুষ্ট যে তাহার স্বভাব সে-স্বভাবের নিখুঁত পরিচয় দেওয়া হয় না বলিয়াই যেন সে বলিয়া ফেলিল, অ, তাই না বলি, রাত থাকতে উঠে মেয়ের খালের ঘাটে যাওয়ার আর আলিস্যি নেই। মরণ আর কি! শত্তুরের সঙ্গে চলেছে তবে গোপনে মিতালি! হা, হা, হা!

টিয়া মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শত্তুর-পুরীতে যার বাস সে মিতালি করতে মিত্র পাবে কোথায় শুনি? আমার খুশী, আমি করবো শত্তুরের সঙ্গেই মিতালি কিন্তু শত্তুরের সাম্‌নে বেহায়াপনা করতে তোমার লজ্জা করে না সজ্জন-বাড়ীর বউ হ'য়ে?

রূপসী আনন্দে সত্যই মাত্রা হারাইয়াছিল এবং সজ্জন-বাড়ীর বউয়ের মাথায় দত্ত-বাড়ীর ছেলের সাম্‌নে ঘোম্‌টা না থাকাটা যে অপরাধের তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। টিয়া তাহা তাহার স্মরণে আনিয়া দিতেই সে টিয়াকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলিয়া গেল—ই—স্‌!

আর চলিয়া যাওয়ার কালে মাথায় ঘোম্‌টাটি তুলিয়া দিয়াই রূপসী চলিয়া গেল।

সুন্দর এতক্ষণ যেন প্রস্তরমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল; সহসা সম্বিত ফিরিয়া পাওয়ার মত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াই যেন বলিল, এপারে টিয়া ধরতে এসে তোমার বহু-গঞ্জনার কারণ হ'য়ে রইলাম টিয়া। এ নিয়ে তোমাকে বহু কথাই হয়ত শুনতে হবে ভবিষ্যতে।

টিয়া রূপসীর আবির্ভাবে যত না বিব্রত হইয়াছিল ততোধিক বিব্রত হইল সুন্দরের অনুতাপ-মিশ্রিত কণ্ঠের করুণ আর্দ্রতায়। কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লাইতে চেষ্টা পাইয়া বলিল, গঞ্জনা যার অদৃষ্টের লেখা তার কারণ হ'তে হয় না দুনিয়ার কাউকে। আর তুমি যদি সত্যিই আমার গঞ্জনার কারণ হ'য়ে ওঠো ত—সে-গঞ্জনা আমি সইতে পারবো অনায়াসেই, তা'তে আমার থাকবে তবু সান্ত্বনা। সে যাই হোক্, সজ্জন-বাড়ীর সীমানার মধ্যে আর ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না, কারণ বহু পুরুষের ঘুমন্ত শত্রুতা আবার আমাকে ছুঁয়ে জাগতেই বা কতক্ষণ!

সুন্দর বলিল, তা যদি জাগেই টিয়া ত জাগুক্, এ ছাই-চাপা আগুনের চেয়ে সে ঢের ভাল।

টিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ভাল বুঝি! তবে জাগুক্, সজ্জন-বংশের রক্তের পরিচয় দিতে আমিও তখন পিছ্‌পাও হবো না জেনো।

সুন্দরও হাসিয়া বলিল, পিছ্‌পাও হবে কেন, আর হ'তেই বা আমি বলবো কেন; একেবারে গিয়ে দত্ত-বাড়ীর ঘাটেই কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে উঠো, সজ্জন-বাড়ীর লক্ষ্মীকে সাদরে বনপলাশীর দত্তরা সেদিন ঘরে তুলে নেবে।

সুন্দর দত্ত-বাড়ীর ঘাটে নৌকা লাগাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। এই উপরে ওঠার সামান্য পথটুকু এবং উপরে উঠিয়াও সে কতবার যে সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেলিল তাহার আর হিসাব নাই; শেষে নিজের কাছেই নিজেকে ভারি তাহার লজ্জা পাইতে হইল, কাজেই আর সেখানে দাঁড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। লজ্জা-বোধের চকিত হাসি হাসিয়া সে বাগানের পথ ধরিয়া বাড়ীর দিকে যেন একটু দ্রুতই চলিয়া গেল।

টিয়া এপারের ঘাটে বসিয়া ওপারে সুন্দরের কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে খুশীর হাসিই হাসিল। দুই-একবার লজ্জায় সেও যে সুন্দরের দিক হইতে

মুখ ফিরাইয়া নেয় নাই—এমন না, কিন্তু সুন্দরকে যতদূর পর্য্যন্ত যাইতে দেখা গেল ততদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া দিয়া সে দেখিল, তারপরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে কেমন যেন মন-মরা হইয়া পড়িল। অতি-নিকট ভবিষ্যতে বাড়ী ফিরিয়া যে কলুষিত রঙ্গমঞ্চে তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহারই আশঙ্কা বোধ করি তাহার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা সুনিবিড় অবসাদ ঘনাইয়া তুলিল।

টিয়ার বাসন মাজিয়া ঘাট হইতে ফিরিতে তাই আজ অধিক বিলম্ব হইয়া গেল। বাড়ীর উঠানে যখন তাহার পা ঠেকিল তখন মনে হইল রূপসীর বিকৃত হাসির ঢেউ যেন মাটিতে আসিয়া ঠেকিতেছে এবং তাহারই দোলা যেন সে সে-মাটির স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত ক্ষণ-বিচ্ছুরিত হইয়া গেছে বলিয়া অনুভব করিল।

রূপসী তাহার ঘরের দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া সত্যই হাসিতেছিল। টিয়াকে বিব্রত করিতে পারার বাহাদুরিতেই যেন সে হাসিয়া খুন হইতেছিল। টিয়ার সে যে আপনার মা না হইলেও মাতৃস্থানীয়া তাহা তাহার খেয়ালই যেন ছিল না। টিয়া তাহার সখী-স্থানীয়া হইলে একমাত্র এ-হাসি মানাইতে পারিত ; কিন্তু সামাঞ্জস্য-বোধহীনতা রূপসীর জন্মগত সম্বল, সেখানে সে নির্ভুল এবং একেবারে অদ্বিতীয়া।

টিয়ার ক্ষণিকের জন্য একবার সে নির্লজ্জ হাসি শুনিয়া মনে হইয়াছিল, ও-মুখ পা দিয়া মাড়াইয়া দিয়া ও-হাসি বন্ধ করাই যেন উচিত, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এ-চিন্তার জন্যও অনুশোচনায় মন তাহার তিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পরেই নির্ম্মম নিয়তির বিরুদ্ধে নিজেকে স্থির রাখিবার সংকল্পে মন তাহার দৃঢ় হইয়া উঠিল। সে সুসংযত পাদবিক্ষেপে রান্নাঘরের দিকে বাসনের পাঁজা লইয়া এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন রূপসীকে সে দেখেও নাই, বা তাহার হাসি তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই মন তাহার কেন জানি আবার বিকল

হইয়া গেল। আজ নিজের গর্ভধারিণী বর্ত্তমান না থাকায় নৈরাশ্যই যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুষড়াইয়া দিল। আজ দুনিয়ায় তাহার এমন একজন নাই যাহার কাছে সে একটা আব্দার জানাইতে পারে, অন্যায় অপরাধের পরেও অভয় পাইতে পারে, সান্ত্বনা খুঁজিতে পারে। সেই একজনেরই অভাবে আজ সমস্ত দুনিয়া যেন তাহার সঙ্গে বৈরীতা সাধিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, আর সে যেন শত্রু-বেষ্টিত হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে নিরস্ত্র দাঁড়াইয়া অতর্কিত আঘাতের জন্য নিজেকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে। না, এ কণ্টকিত মৃত্যু-শঙ্কাপূর্ণ ভয়াবহ জীবন একেবারে অসহ্য।

টিয়া কাপড়ে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই ফুলিয়া ফুলিয়া আকুল হইয়া কান্নার মধ্যেও তাহার মায়ের মুখ আজ তাহার চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়া রহিল। এমন করিয়া টিয়া মায়ের জন্য আর কখনই জীবনে কাঁদে নাই, অবশ্য এমন গভীরভাবে জীবনে তাঁহার প্রয়োজনও সে আর কখনও অনুভব করে নাই।

টিয়া অঝোরে কাঁদিয়াই চলিয়াছিল। কাঁদিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল।

তাহার পিঠের উপরে মানুষের হাত ঠেকিতেই সে সহসা চম্‌কাইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু মুখের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া লইতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল।

মনোহর একেবারে টিয়ার পাশেই উবু হইয়া বসিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়াছিল। বলিল, ছিঃ টিয়া, তুমি কাঁদচো?

টিয়া কোনরকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, হুঁ, কাঁদচি বই কি! আমি কাঁদব না ত কাঁদবে কে শুনি? দুনিয়ায় আমার মত দুঃখিনী আর কে আছে? মা'র কথা মনে প'ড়ে গেলে আমি না কেঁদেও পারি না যে!

মনোহর সে-কথায় যেন কর্ণপাত না করিয়াই বলিল, আমাকে ফিরে আসতে দেখে তুমি অবাক হ'চ্ছ না টিয়া ? কই, সে কথা ত একবারও জিগ্যেস্ করলে না ?

টিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, আমার মনের অবস্থা আজ ভাল না, তাই ভুল হ'যে গেচে। সত্যি, তুমি আবার ফিরেই বা এলে কেন ?

—ফিরে এলাম—কেন ? আমি নিজেই তা এখন ভেবে পাচ্ছি না। বলিয়া মৃদু একটু হাসিয়া মনোহর আবার বলিল, তোমাকে সত্যিই ছেড়ে যেতে পারলাম না টিয়া। যাত্রার দল যে তোমার দু'চক্ষের বিষ সে আমি বেশ বুঝতে পেরেচি ; না, আর কখনও যাত্রার দলে আমি ফিরে যাব না। তোমাদের শিখীপুচ্ছের বাজারখোলা পর্য্যন্ত গিয়েই মন আমার কেমন বিগড়ে গেল টিয়া। এবার ঠিক করেচি, নূপুরগঞ্জের হাটে একটা মনিহারি দোকান খুলব আমি, ব্যবসায় মন দেব। আর ভাল কথা, তোমার জন্যে তোমাদের শিখীপুচ্ছের বাজার থেকে একটা তেল কিনে এনেচি টিয়া। 'চম্পল্'-এর খোঁজ ক'রে না পেয়ে শেষে কমলা-লেবু রঙের একটা তেল নিয়ে এলাম, কেমন যে হবে তা কে জানে। কথা আমার রেখেচি, এই দেখো টিয়া।

বলিয়া মনোহর পকেট হইতে একটা কাগজে মোড়া তেলের শিশি বাহির করিয়া টিয়ার সম্মুখে ধরিল।

টিয়া সেদিকে চাহিয়া নিজে একটু সামান্য পিছাইয়া গিয়া বলিল, কি তোমার আক্কেল মনোহর মামা, আমি কি সুগন্ধি তেল ব্যাভার করি কখনও—যে তুমি পয়সা খরচ ক'রে আবার তা নিয়ে এলে ?

মনোহর সহজভাবেই বলিল, বা রে বা, আমি দিলে তুমি তা ব্যাভার করবেই বা না কেন ? আর, আমি ত তোমার পর নই টিয়া, আমি তোমাকে আমার অতি আপনজন ব'লেই মনে করি। তুমি এ তেল না নিলে আমি সত্যিই মনে বড় ব্যথা পাব।

টিয়া বিশেষ বিব্রতভাবে মনোহরের দান নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্বেও গ্রহণ করিল। মনোহরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে তাহার বাধিল।

টিয়ার এ সামান্য দান গ্রহণে মনোহর বেশ একটু সলজ্জ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি তাই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দিদিকে তার ঘরে দেখেও কথা না ক'য়ে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করলাম। দিদির আবার মেজাজ যে রকম—তাতে হয় ত তোমাকেই এর জন্যে আজে-বাজে দশকথা শুনিয়ে দেবে। যাই বাপু, তার সঙ্গে দেখাটা ক'রে ব'লে আসি যে, ফিরে এলাম।

মনোহর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে টিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রান্নার জিনিসপত্র আনিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেল।

রূপসী মনোহরকে দেখিয়া খুশী হইতে পারিল না। কিন্তু একজন কথা কওয়ার মত লোক পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। নিশি সজ্জন সকালবেলা মনোহরের বিদায়ের পরেই যে কি কাজে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে কেহই জানে না, এখন পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া আসে নাই, কখন যে আসিবে তাহারও কিছু ঠিক নাই। কাজেই সকালবেলা আজ ঘাটের পথে যে-দৃশ্যটি তাহার চোখে পড়িয়াছে তাহারই একটা অতিরঞ্জিত বর্ণনা কাহারও কাছে দিতে না পারিয়া রূপসীর মন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মনোহরকে যে সেকথা বলিয়া খুব সুখ হইবে না সে তাহাও বুঝিল, যেহেতু টিয়ার প্রতি মনোহরের বিশেষ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়াই সে জানে। তবু না বলিয়াও থাকিতে পারিল না।

কিন্তু রূপসী সুরু করিতেই মনোহর দিল বাধা। তাহার এই হঠাৎ ফিরিয়া আসার কারণ এবং উদ্দেশ্য সর্ব্বাগ্রে ব্যক্ত করা সে প্রয়োজন মনে করিল। রূপসী আবার জন্মাইল মনোহরের বাক্য সুরুর পূর্ব্বেই বাধা।

শেষ পর্য্যন্ত রূপসীর বাসনাই জয়ী হইল। সে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটা একটা উপাখ্যানের মত করিয়া বর্ণনা করিবার প্রবল লোভে বিকৃত এবং সত্যবর্জ্জিত একটা কিছু গড়িয়া তুলিল সত্য, কিন্তু মনোহরকে সে বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিতে পারিল না।

মনোহর সমস্ত শুনিয়া বলিল, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, সুন্দর আবার এপারে এসে কাঁঠাল গাছের নীচে দাঁড়াবে। সাত পুরুষের শত্রুতা ভুলে এপারে আসা যেন চারটিখানি কথা।

—ও মা-গো! তবে কি আমি মেয়ের নামে একটা গপ্‌পো রচনা ক'রে বলচি নাকি? আমার যেন তা হ'লে নরকেও স্থান হয় না।—বলিয়া রূপসী এমন একটা ভঙ্গী করিল যে মনোহর রীতিমত শঙ্কাক্রান্ত হইয়া উঠিল, পাছে রূপসী আবার বসিয়া মরা-কান্না সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু রূপসী তেমন কিছু করিল না দেখিয়া মনোহর আশ্বস্ত হইয়া বলিল, তা টিয়ার জন্যে শত্রুতা ভুলে এপারে আসাটা খুব বিচিত্র ব'লেও আমি মনে করি না দিদি। তোমার সতীনের মেয়েটি সত্যিই ভাল দিদি।

—অঃ, আমার মরণ!—বলিয়া রূপসী রাগে যেন দাপাইয়া দাপাইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। এমন কি, মনোহরের ডাকেও সে ফিরিয়া দাঁড়াইল না এবং মনোহরের বলার যাহা ছিল তাহাও আর বলা হইল না।

টিয়া রান্নাঘরের দরজায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া সমস্তই শুনিল। কারণ, তাহাকে শুনাইয়াই কথাগুলি বলা হইয়াছিল। এতক্ষণে টিয়ার হাসি পাইল, দুঃখের মাঝেও তাহার হাসি পাইল, রূপসীর নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নীচতা মানুষকে না হাসাইয়াই যেন পারে না—এমনই টিয়ার মনে হইল।

রূপসী ঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মনোহর কেমন যেমন দুর্ব্বল হইয়া উঠিল, মন তাহার বিষণ্ন ভারাতুর হইয়া উঠিল। টিয়ার

মন কি সত্যই তবে সুন্দর পাইয়াছে, সেখানে কি তাহার আর স্থান হওয়ার কোন আশাই নাই, তবে কি ফিরিয়া আসা তাহার একেবারে অর্থশূন্য হইয়া যাইবে? কিন্তু কেনই বা সে টিয়ার মন পায় না? টিয়া কেন সুন্দরকে তাহার অপেক্ষা যোগ্য বলিয়া মনে করে? এই সব সাধারণ প্রশ্নগুলিই সহসা মনোহরের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সদুত্তর কিছু মিলিল না। আর কোন দিন মিলিবে বলিয়াও সে আশা করিতে পারিল না। শুধু মনে হইল, ফিরিয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই। কিন্তু টিয়াকে যে সত্যই তাহার ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে, বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা যে পিছনে পড়িয়া যায়—তাই ত তাহাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। এখন সে-কারণে আবার তাহাকে অনুতাপও করিতে হইতেছে। নিজের জন্য আজ তাই তাহার দুঃখও হইল, অনুকম্পাও জাগিল।

নিশি সজ্জনের বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব হইল, কিন্তু ঘটনা শুনিতে বিলম্ব হইল না। তাহার বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রূপসী বারান্দায় একটা বেতের মোড়া পাতিয়া তাহাকে বসিতে দিয়া নিজে একটা হাতপাখা লইয়া সম্মুখে বসিল। আজ জীবনে এই প্রথম যেন নিশি সজ্জন ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, রূপসীর হাব-ভাবে তেমনই কিছু মনে হয়। রূপসী এযাবৎকাল কখনও পাখা লইয়া নিশি সজ্জনের পাশে বসে নাই। নিশি সজ্জন রূপসীর এ নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া এমনই বিমুগ্ধ হইয়া গেল যে, এ ব্যাপারের অসঙ্গতিটুকু তাই তাহার চোখেও পড়িল না। কিন্তু ঘটনা যখন রূপসী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া উঠিল তখন নিশি সজ্জনের চোখে রূপসীর এই পাখার বাতাসের সহজ অর্থটা ধরা পড়িল, তাহার পূর্ব্বে ধরা পড়ে নাই।

নিশি সজ্জন সমস্ত শুনিয়া শুধু বলিল, এ সমস্তই সত্যি? বেশ, আবার সুরু হ'ল তা হ'লে, আবার কলঙ্কিনীর খাল লাল হয়ে উঠবে।

আমার ডাঙায় পা দেবে দত্ত-বাড়ীর ছেলে, আর আমি মুখ বুজে তা সইব—অসম্ভব। টিয়া কোথায়?···টিয়া, অ টিয়া! তাকে খুন ক'রে তবে আজ আমার অন্য কাজ। সে আমার মেয়ে হ'য়ে কি-না আমার মান-সম্মান সমস্ত দেবে জলাঞ্জলি, এই হ'ল কি-না সজ্জন-বাড়ীর মেয়ের মত কাজ?

টিয়া নিশি সজ্জনের কাছে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। সকলপ্রকার লাঞ্ছনার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। মনোহর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া টিয়াকে নিশি সজ্জনের দৃষ্টি হইতে এক-প্রকার আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দিদির কথায় যেন কান দেবেন না জামাইবাবু, টিয়ার কথাই আগে শুনে নিন্। দিদির ত গুণের ঘাট নেই, প্রয়োজন হ'লে আপনার নামে হাজার কথা বানিয়ে বলতেও ওর জিবে আটকায় না।

টিয়া তাড়াতাড়ি অমনি বলিল, না মনোহর মামা, তুমি যা জান না তা নিয়ে কেন কথা কও। ছোটমা ত সত্যি কথাই সব বলেচেন। দত্ত-বাড়ীর ছেলে সুন্দর এপারে সত্যিই আজ এসেছিল। তার টিয়া-পাখী উড়ে এসে বসেছিল আমাদের কাঁঠালগাছের ওপর, কাজেই সে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

রূপসী টিয়ার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে মনোহরের দিকে চাহিয়া সম্মুখ-সমরে আহ্বানের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, কেমন, হ'ল ত এইবার! বানিয়ে বলা কথা, জিবে আমার আটকায় না! বলি, অত গরজ কারও জন্যে কারও ভাল না। আমাকে মিথ্যুক বানাতে গিয়ে পুড়ল ত মুখ নিজের? ওপরে ভগবান আছেন!

বলিয়া রূপসী মনের আনন্দে উপস্থিত সকলকে ভুলিয়া গিয়া এক অতি হাস্যকর ভঙ্গীতে অমুদ্দেশ্যে হাত যুক্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়া প্রণিপাত করিল।

নিশি সজ্জন এতক্ষণ ঘটনাটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ তাহার উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাহার বেশীক্ষণ কাটিল না। টিয়া সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া উপযুক্ত শাস্তির প্রতীক্ষাই করিতেছিল।

নিশি সজ্জন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে টিয়ার উপর যেন সগর্জ্জনে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, না, না···এ আমাদের বিখ্যাত সজ্জন-পরিবারের মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আমি বেঁচে থাকতে এসব হ'তে পারবে না, কিছুতেই না। হ'তে পারে তার টিয়া, কিন্তু সে কেন আমার সাতপুরুষের ভিটের মাটিতে পা ছোঁয়াবে? আমি বাড়ী থাকলে আজ তাকে খুন ক'রে তবে হ'ত অন্য কথা! লক্ষীছাড়া মেয়ে, তোর জন্যে মান-কান আমার সব ডুবল। বেরিয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। নইলে, খুন ক'রে আমি আমার আফসোস মেটাবো।

মনোহরই আবার বাধা দিল। নিশি সজ্জনের বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় সে সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এ আপনি করচেন কি জামাইবাবু? টিয়ার কি দোষ হয়েচে শুনি? সে কি কোমর বেঁধে যাবে নাকি দত্ত-বাড়ীর ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে, না তাই কখনও সম্ভব? কি যে করেন, মিছে ওকে আর কাঁদাবেন না। দিদির কথাতেই ওর যথেষ্ট হয়েচে। দেখচেন না—কি ভাবে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েচে।

টিয়া ইতিমধ্যেই চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়াছিল, কারণ পিতার এ রূঢ়তায় নিজেকে সে আর সামলাইতে পারে নাই।

নিশি সজ্জন আবার যথাস্থানে গিয়া বসিল এবং অনুপশমিত উত্তেজনার বিক্ষোভে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, তবে সুরুই হোক্। আমি দেখে নেবো।

কিন্তু সুরু যে হইবে না তাহা নিশি সজ্জন ভাল করিয়াই জানে। ভৈরব

দত্ত লোকটা নিশি সজ্জনের মতে মহা কাপুরুষ, কিছুতেই সে কলঙ্কিনীর খালের দুই পারের দুই বাড়ীতে আবার কলঙ্কের সূত্রপাত হইতে দিবে না। কত বার ত নিশি সজ্জন চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগা সত্ত্বেও ভৈরব দত্ত নীরবে তাহা সহ্য করিয়া গেছে। কাজেই নিশি সজ্জনের উত্তেজনার মধ্যেও কেমন যেন একটা হতাশা প্রকাশ পায়, কেমন যেন একটা দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়।

আনন্দ-উল্লাস যখন মাত্রা ছাপাইয়া যায় তখন মানব-হৃদয়ে জাগে কেমন একপ্রকার অকরুণ শূন্যতা। সুন্দরের হৃদয়েও সেই শূন্যতা বিরাজ করিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিয়া সুন্দর মহা সমস্যায় পড়িল। কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে তাহার কেমন যেন বাধিতেছিল, মুখে না জানি তাহার মনের ছায়া পড়িয়াছে, না জানি লোকে তাহার মনের কথাটাই বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু এত বড় আনন্দ-ঘন দিনও ত জীবনে তাহার আর কখনও ইতিপূর্ব্বে আসে নাই, কাজেই আজ লোকের সম্মুখে না দাঁড়াইতে পারিলেও যে সে স্বস্তি অনুভব করিতেছে না। নূপুরগঞ্জের হাট হইতে টিয়াটা কিনিয়া আনা তাহার সার্থক হইয়াছে, টিয়াটা যে বন্ধন কাটাইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহাতেও তাহার এখন আর ক্ষোভ নাই ; সে তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দরকে বিশেষভাবে লাভবান করিয়া গেছে। তাহারই দরুণ সে শুধু সজ্জন-বাড়ীর সীমানার মধ্যে পা বাড়াইয়াছিল, আর তাহারই ফলে নিশি সজ্জনের মেয়ে টিয়াকে কথার জাল ফাঁদিয়া ধরিবার একটা সুবর্ণ সুযোগও সে পাইয়াছিল। কিন্তু বিশ্ব-ভুবনে যে এক অপূর্ব্ব কুহক সৃষ্টির আদি-অন্ত পর্য্যন্ত তাহার সাতরঙা মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া দিয়া বসিয়া আছে, সেই মায়াজালে তাহারা ইতিপূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল ; আজ হয় ত নড়িয়া চড়িয়া তাহারা সে-জাল আর একটু শক্ত করিয়া অঙ্গের সঙ্গে জড়াইল।

সুন্দর কেবলই টিয়ার কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। কত রকম যে তাহার অর্থ হইতে পারে, কত রকম যে তাহাতে ইঙ্গিত থাকিতে পারে তাহাই সে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু কিছুতেই সে স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না। একথা কাহারও কাছে ব্যক্ত না করিয়া তাহার যেন আর মুক্তি নাই। শ্রীমন্ত সহসা আসিয়া গেলে বেশ হইত। কিন্তু শ্রীমন্তর সঙ্গে বাড়ী বহিয়া গিয়া দেখা করিতেও তাহার আজ কেমন যেন বাধিতেছিল। শ্রীমন্ত হয় ত ইহা লইয়া কত অকারণ বিদ্রূপ করিবে, সুন্দর লজ্জায় পড়িয়া যাইবে। অথচ, সে-কারণে এক একবার তাহার লোভও জন্মিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সে শ্রীমন্তদের বাড়ী গেল। সেখানে বসিয়া আজে-বাজে অনেক কথাই সে বলিল, কিন্তু যাহা বলিতে সে গিয়াছিল তাহা আর বলা হইল না। না বলিয়াই সে মুখে লাজ-কৌতুক জড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। তবে শ্রীমন্তকে সে রাজি করাইয়া আসিল যে, আজ রাত্রে উভয়ে নৌকা লইয়া হাজারখুনীর বিলে বেড়াইতে যাইবে। রাত্রের নিভৃত নিরালায় মনের কথা খুলিয়া বলিতে সুন্দর খুব সহজেই পারিবে। এই বন্দোবস্ত করিয়া সে কতকটা তবু স্বস্তি অনুভব করিল।

রাত্রে আহারাদির পর শ্রীমন্ত তাহাদের নৌকা লইয়া সুন্দরকে ডাকিতে আসিল। সুন্দর প্রস্তুত হইয়াই ছিল। শ্রীমন্তর সঙ্গে নৌকায় আসিয়া উঠিল।

নৌকা হাজারখুনীর বিলের দিকে ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নৌকা কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্রীমন্তই প্রথম কথা কহিল। বলিল, আর ত একমাসের মধ্যেই পূজো। দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল একেবারে!

সুন্দর আস্তে করিয়া প্রথম শুধু বলিল, হুঁ। তারপরে একটু সময়

লইয়া গভীর চিন্তান্বিতের মত বলিল, এবার পূজোয় বিপদ আছে অনেক।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, সে কি, বিপদ আবার কিসের?

সুন্দর বলিল, সে অনেক কথা। এবার সত্যি আমার অদৃষ্টে বিপদ লেখা আছে। কিন্তু সে সব আমি গ্রাহ্যি করি না। আমিও মহেশ দত্তের নাতি—সজ্জনদের আমিও ক্ষমা করব না।

শ্রীমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, সে আবার কি!

সুন্দর একটু সময় লইয়া বলিল, দত্ত-বংশের রক্ত বইচে আমারও মধ্যে, শত্রুর সঙ্গে আমারও চুটিয়ে শত্রুতা। সজ্জন-বাড়ীর ঐ একরত্তি মেয়ের কথা শুনে গা আমার জ্বলে যাচ্ছে। কি ওর আস্পর্দ্ধা—আমাকে কি-না মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ্ করলে আজ! এবার আর মিষ্টি কথা না—সড় কি-বল্লম নিয়েই বেরুতে হবে। দেখা যাক্ এবার, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

শ্রীমন্ত নীরবে সুন্দরের সব কথা শুনিয়া বিপুল বেগে হাসিয়া উঠিল। সুন্দর সে-হাসির বেগে চম্‌কাইল না, কিন্তু বলিতেও কিছু পারিল না।

শ্রীমন্ত বিদ্রূপ-ঘনকণ্ঠে বলিল, এই গভীর প্রেম, আর এরই মধ্যে চ্যালেঞ্জ্ একেবারে! শেষ পর্য্যন্ত যাত্রার দলের সেই ছেলেটিরই বুঝি জয় হ'ল? তা ত হবেই—সে হ'ল গিযে গাইয়ে-বাজিয়ে চৌকস ছেলে, তোর সঙ্গে কি তার তুলনা হয়! বেশ, বেশ, এখন যুদ্ধং দেহি ছাড়া আর উপায় কি?

সুন্দর সহসা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না রে না, আজ সকালে ভারি এক মজার ব্যাপার হ'য়ে গেচে। তাড়াতাড়ি একটু বেয়ে চল্, হাজারখুনীর বিলে গিয়েই তোকে সেকথা বলব, নইলে কে কোথায় আবার তা শুনে ফেলবে।

শ্রীমন্ত অমনি ঠোঁট কাটিয়া বলিল, হুঁ, মজার ব্যাপার বুঝি! তা আজকাল ত উঠতে বসতে তোর মজার ব্যাপার ঘটবে জানি।

—তা ত ঘটবেই।—বলিয়া সুন্দর খালের জলে বৈঠার ঘা মারিয়া শ্রীমন্তর গায়ে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত গায়ে জল লাগায় একটু চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এতদিনে সত্যিই তুই মরেচিস্ দেখতে পাচ্ছি। বেশ, বেশ, এইবার একটা শুভদিন দেখে—

সুন্দর বৈঠার ঘায়ে আবও খানিকটা জল শ্রীমন্তর গায়ে তুলিয়া দিয়া তাহাকে মাঝপথেই নীরব করিয়া ছাড়িল। শেষে বলিল, আর বলবি কখনও ?

এমনই সব হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়া নৌকা তাহাদের খাল ছাড়াইয়া সুবিস্তৃত হাজারখুনীর বিলে আসিয়া পড়িল। দিগন্ত জুড়িয়া জলরাশি—তাহারই 'পরে রাত্রির আঁধার যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়া কান পাতিয়া দিয়া প্রিয়তমের মত প্রেম-গুঞ্জরণ শুনিতেছে—প্রিয়ার কণ্ঠ যেন আবেশ-আবেষ্টনে জড়াইয়া আছে ; আর জলরাশি গরবিনী প্রিয়ার মত অকুণ্ঠিত-কণ্ঠের সুধা যেন ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে উল্লাস-স্তব্ধ প্রিয়তমের সতর্ক কর্ণকুহরে।

হাজারখুনীর বিলে পড়িয়াই সুন্দর সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়া সকালের ঘটনা বিবৃত করিতে সুরু করিল। বিনা বাধায় আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া যখন একটা নিশ্বাস চাপিয়া গিয়া সে থামিল তখন শ্রীমন্ত মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া লইয়া বলিল, সা-বা-স্!

এভাবে টানিয়া টানিয়া বলায় সুন্দর একটু বিচলিত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না ; কারণ শ্রীমন্ত তাহাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য যে বিদ্রূপ করে নাই তাহা সে সহজেই বুঝিল।

সুন্দর মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, তুই ত সাবাস্ ব'লেই খালাস কিন্তু এর ফলে যে কি সাংঘাতিক দাঁড়াবে সে জানি আমি। টিয়ার

সংমা যখন আমাকে সেখানে দেখে গেচে একবার তখন কলঙ্কিনীর খাল আবার রক্তে লাল না হ'য়েই পারে না। পূজোও এসে গেল—এইবার ভাসান নিয়েই হয় ত বাধে দু'বাড়ীতে।

থাক্, আর না বাঁধতে হ'লো!—বলিয়া শ্রীমন্ত চমৎকার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে একটু হাসিল, তারপরে বলিল, না, না, বাঁধতেই হবে—একটা সাঁকো, এপার-ওপার ক'রে।

সুন্দর শ্রীমন্তর কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া আর পারিল না। বলিল, হ্যাঁ, যদি বাঁধতেই হয় ত তোকে ডাকব সেদিন।

শ্রীমন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এই রাত ক'রে হাজারখুনীর বিলে যে আমাকে নিভৃতে ডেকে আনা হয়েচে সে ত ঐ সাঁকো বাঁধবার জন্যেই। ডাক ত আমার বহু আগে থেকেই পড়েচে, আর আমিও আমার যথাসাধ্য করচি।

সুন্দর শ্রীমন্তর কথায় খুশী হইয়া গিয়া বলিল, খুব যে আজকাল কথা কইতে শিখেচিস্ দেখতে পাই!

—সত্যি নাকি?—বলিয়া শ্রীমন্ত একটু হাসিল, তারপরে বলিল, সেটা হয়েচে তবে তোর সংসর্গ দোষে। তোর মত ভাল মানুষের মুখ দিয়েই যা সব কথা বেরুচ্ছে আজকাল, তা আমার আর না বেরুবেই বা কেন!

সুন্দর আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, খুব হয়েচে, এখন বাড়ী ফিরে যাই চ'।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ, চল্, ফিরেই যাওয়া যাক্। আর তোর কাজ যখন শেষ হয়েচে তখন আর থেকেই বা লাভ কি!

সুন্দর অমনি বলিল, না রে না, রাত হ'য়ে গেচে অনেক।

শ্রীমন্ত হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হাজারখুনীর বিলে এই প্রথম আমাদের অনেক রাত হ'য়ে গেল সুন্দর! সত্যি, ফিরেই চ'।

—তবে আর তোর ফিরে কাজ নেই।—বলিয়া সুন্দর তাহার

বৈঠাটি নৌকার পাটাতনের উপর তুলিয়া রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

শ্রীমন্ত চাপিয়া চাপিয়া হাসিয়া উঠিল। সুন্দর এতক্ষণে সত্যই বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু শ্রীমন্তের উপর তাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ জাগিল না; যেহেতু সুন্দর জানিত, শ্রীমন্ত একটু রঙ্গপ্রিয়। সুন্দর নিজেও তাই হাসিয়া ফেলিল।

পরদিন ভোরেই আবার মনোহরকে যাত্রার দলের উদ্দেশ্যে রওনা হইতে হইল। তাহার এমন সুকল্পিতব্যবসা নিশি সজ্জনের মনে ধরিলেও রূপসীর মনে ধরিল না। কথাটা ভাল সময়েই মনোহর জামাইবাবুর কানে তুলিয়াছিল, কিন্তু কাজে আসিল না, তাহার দিদিই বাধা দিল এবং নিদারুণভাবেই বাধা দিল। নিশি সজ্জন শেষ পর্য্যন্ত তাই রাজি হইতে পারিল না। গত রাত্রে মনোহর জামাইবাবুর পাশে যখন আহারে বসিয়াছিল এবং টিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন রূপসীকে সেখানে অনুপস্থিত দেখিয়া সে কথাটা তুলিয়াছিল যে, শিখিপুচ্ছের বাজারখোলায় একখানি মনিহারি দোকান খুলিলে ব্যাপারটা খুব লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা নিশি সজ্জন অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারিল—লাভজনক যে তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কি আছে। নিশি সজ্জন বে-হিসাবী লোক নয়, কাজেই মনোহরের উপর নিভর করা চলিতে পারে কি-না সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে সে চিন্তা করিতে লাগিল। পরে ভাবিল, নিজে একটু তত্ত্বাবধান করিলেই দুর্ভাবনার কিছু আর থাকিবে না এবং সে মনোহরের প্রস্তাবে অবিলম্বেই রাজি হইয়া গেল।

কিন্তু রূপসীর স্বভাব তাহাদের ঠিক জানা ছিল না, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও কোন কথা শোনা অপেক্ষা নেপথ্যে থাকিয়া চুপিসাড়ে শুনিতে পারিলে সে বিশেষ খুশী হইয়া উঠিত। কাজেই সুযোগ পাইলেই সে চুপি দিয়া কথা শুনিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত। এক্ষেত্রেও সে চুপি দিতে ছাড়ে

নাই। বেড়ার আড়ালে থাকিয়া সে শালা-ভগ্নীপতির শলা-পরামর্শ সকলই শুনিল। শুনিয়াই তাহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আসিয়া মনোহরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, কি, আবার বুঝি ব্যবসা ফাঁদবার মতলব হয়েছে? এবার বুঝি মনিহারি দোকান?

তারপরে নিশি সজ্জনের দিকে ফিরিয়া বলিল, আর রাজ্যে বামুন নেই —এইবার শালা-ভগ্নীপতিতে ব্যবসা সুরু হবে বুঝি? বেশ! কিন্তু ক'দিন সে-ব্যবসা টিকবে শুনি?

মনোহর কেমন একটু বিব্রত হইয়া মাথা নীচু করিল, আর নিশি সজ্জন মাথা তুলিয়া বলিল, সে তুমি নাই শুনলে, ব্যবসার তুমি বোঝ কি?

—বুঝি গো বুঝি, তোমার চেয়ে ঢের বেশী বুঝি!—বলিয়া রূপসী ভ্রূকুটি করিয়া বলিতে সুরু করিল, ব্যবসা করতে হয় কর, কিন্তু টাকা-পয়সা কখনও বিশ্বাস ক'রে যেন মনোহরের হাতে দিও না। সেবার—বাবা তখন বেঁচে ছিলেন, বাবাকে ছেলে বোঝালে যে তিনশো টাকা তাকে ব্যবসার জন্যে দিলে—মাসে তিনশো টাকা সে লাভ দেখিয়ে দেবে। বাবা ছিলেন ভালমানুষ, মনোহরের কথায় বিশ্বাস ক'রে দিলেন ওর হাতে তিনশো টাকা। ব্যস্, টাকা পেয়েই সেই যে গুণধর ভাই আমার উধাও হলেন, আর চার মাসের মধ্যে দেখাই নেই। ওকে বিশ্বাস ক'রে টাকা দিলেই ডুববে তুমি। আমার যা বলা উচিত তা আমি ব'লে দিলাম, এখন তোমার যা খুশী তাই তুমি করগে'।

বলিয়াই রূপসী সেখান হইতে দেমাক-দুর্বিনীত পাদবিক্ষেপে অন্যত্র চলিয়া গেল।

মনোহর একটা কথা কহিয়াও ইহার আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেন না এ দুর্ঘটনা একদিন সত্যই ঘটিয়াছিল। নিশি সজ্জনেরও মন কেমন যেন বিগ্‌ড়াইয়া গেল, সে আর ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথাও কহিল না। উভয়ে নীরবে আহারাদি শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

রান্নাঘরে টিয়া সমস্ত জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে নিজের মনে মনেই বলিয়া উঠিল, বাবা, বাবা, কি মেয়েমানুষ, কারও যদি একটু ভাল দেখতে পারেন। এমন কি, নিজের ভাইয়েরও না।

কিন্তু টিয়া ইহাতে বরং খুশীই হইল। মনোহর যে শিখীপুচ্ছের বাজারে মনিহারি দোকান খুলিয়া এখানে কায়েম হইয়া বসিল না তাহাতে আনন্দ হইল তাহারই। মনোহরের প্রতি তাহার তেমন কোন বিদ্বেষ নাই, কিন্তু মনোহরের উপস্থিতিতে সে কেমন জানি অস্বস্তি অনুভব করে। কাজেই সে চিরন্তন অস্বস্তির হাত হইতে মুক্তি পাইয়া খুশীই হইল।

মনোহর ইহার পরে আর ব্যবসার কথা নিশি সজ্জনের কাছে তুলিতে পারে নাই, রূপসীর কথারও প্রতিবাদ কিছু করে নাই, টিয়ার সঙ্গেও দেখা করে নাই ; যাত্রার দলেই আবার যোগ দিতে শিখীপুচ্ছ ছাড়িয়া ভোরের দিকেই চলিয়া গিয়াছে। রূপসী সত্যই তাহার দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিয়া টিয়ার চোখে তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ছাড়িয়াছে। ব্যবসা সে করিতে পারিল না—সে কারণে তাহার দুঃখ হইল না, কিন্তু টিয়া যে তাহাকে কত ছোট ভাবিল তাহাতেই সে যেমন ছোট হইয়া গেল তেমন দুঃখও আবার তাহার গভীরতম হইয়া দেখা দিল।

মধ্যাহ্নে অমিয় সারকেলের মেয়ে বাব্‌লি একটা জোরালো সংবাদ লইয়া হাজির হইল। টিয়া তখন নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল, আর অপরের নিকট হইতে তাহা গোপনের জন্য দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া একখানি কার্পেটের আসন বুনিতেছিল।

বাব্‌লি জানাইল, আজ নবদুর্গার সরোজবাবু এসেচেন। দুর্গাকে কাল নাকি নিয়ে যাবেন। একবার ওর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি চ', কাল ভোরেই হয় ত চ'লে যাবে। আর সেবার বিয়ের সময় ভিড়ের

মধ্যে তেমন আলাপ করা ত হয়নি, এবার করা যাবে'খন। রাখ্ তোর আসন বোনা এখন।

টিয়া কার্পেট, স্ূঁচ ও পশম পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, বলিস্ কি বাব্‌লি, দুর্গা যে সাতদিনও এসে এখানে রইলো না, আর এরই মধ্যে নিয়ে যাবে কি রকম?

বাব্‌লি তাড়াতাড়ি বলিল, উঠে চল না, সরোজবাবুকে দু'কথা তাই নিয়ে শুনিয়ে দেওয়া যাবে বেশ।

টিয়া বলিল, না ভাই, দুর্গা চ'লে যাবে এরই মধ্যে—আমার যেন ভাল লাগচে না।

বাব্‌লি তখন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তা ভাল না লাগে সরোজবাবুকে ব'লে দু'দিন এখানে আটকে রাখিস্। উঠে আয় এখন শীগ্‌গির।

টিয়া তবু উঠিতে পারিতেছিল না। ছোটমা রূপসীর নিকট হইতে অনুমতি লওয়া প্রয়োজন কি-না সেই কথাই সে ভাবিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি না লইয়াই বাব্‌লির সঙ্গে সে নবদুর্গাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন কথা হইল না। নবদুর্গাদের বাড়ীর উঠানে আসিয়াই তাহারা দেখিল, নবদুর্গা ঘোম্‌টা টানিয়া ত্রস্ত অথচ সলজ্জপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছে। বাব্‌লি তাড়াতাড়ি একপ্রকার ছুটিয়া গিয়া নবদুর্গাকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। টিয়াও প্রায় বাব্‌লির পিছু পিছু আসিয়াছিল, সেও নবদুর্গার বড় করিয়া টানিয়া দেওয়া ঘোম্‌টা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

নবদুর্গা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আঙুল তুলিয়া তাহাদের পশ্চিমের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া চাপা মৃদুকণ্ঠে বলিল, এই—এখানে আর টানাটানি করিস্ না মাইরি—ঐ ওঘরে ব'সে আছেন, এখুনি দেখে ফেলবেন।

বাব্‌লি নবদুর্গার কথা শুনিয়া ব্যঙ্গ-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে, তোর আবার এত লাজ-লজ্জা হ'লো কবে থেকে ?

টিয়া বলিল, আমরা যে আলাপ করতে এলাম ; কই, আলাপ করিয়ে দিবি চ'।

—না, ধ্যেৎ !—বলিয়া নবদুর্গা বাব্‌লির হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। তাহাতে ফল ভাল ফলিল না, টিয়াও তাহার কাপড়ের একাংশ চাপিয়া ধরিল।

বাব্‌লি বলিল, আজ আর ছাড়াছুড়ি নেই। আমাদের সাম্‌নে সরোজবাবুর সঙ্গে তুই কথা বল্‌বি—আমরা শুনবো।

টিয়া বলিল, হুঁ ভাই, সেটি কিন্তু হওয়াই চাই।

—বেশ, হবে। এখন কাপড় ছাড়্‌। বলিয়া নবদুর্গা উভয়ের হাত দুই হাত দিয়া ধরিল। তাহারা কাপড় ছাড়িয়া দিলে নবদুর্গা তাহাদের ডাকিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। রান্নাঘরে আজ তাহাদের বিরাট ঘটা হইয়া গেছে, নবদুর্গার মা সেখানে তখন কাজে ব্যস্ত ছিল এবং একমাত্র তাহারই আহারাদি তখনও বাকী ছিল।

নবদুর্গাকে বাব্‌লি ও টিয়ার সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নবদুর্গার মা বলিলেন, কেমনধারা মেয়ে বাপু তুই দুর্গা, একবার দেখাটি পর্য্যন্ত দিয়ে এলি না ?

নবদুর্গা মায়ের কথায় মহা বিব্রত হইয়া বলিল, তোমার যেমন কথা মা, আমি যাবো ঐ একঘর লোকের মাঝে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে ! আর বাবার সঙ্গেই ত ব'সে কথা কইচে, সেখানে কি যাওয়া যায় নাকি কখনও ?

নবদুর্গার মা বলিলেন, আর কর্ত্তারও বলি বাপু, বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি ওঁর একটুও থাকে। সমস্ত সকাল দুপুরে যদি জামাইকে একটু রেহাই দিলে। বেচারা হয় ত এতক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেচে। জামাই আমার নেহাত

ছেলেমানুষ—তার সঙ্গে অত কি বুড়ো বুড়ো কথারে বাপু সারা সকাল-দুপুর !

নবদুর্গা বিশেষ লজ্জায় পড়িয়া গিয়া বলিল, হয়েচে, তুমি এখন থামো ত মা ।

বাব্‌লি তৎক্ষণাৎ বলিল, কেন মাসিমা ত ঠিকই বলেচেন ।

নবদুর্গার মা বলিলেন, মানুষের একটু বিবেচনা থাকা ত উচিত। কর্তার যেন সে সব কিছু বলতে কিছু নেই। যা না বাব্‌লি, জামাইকে ডাক দিয়ে তুলে নিয়ে আয় দক্ষিণের ঘরে—আমার নাম ক'রেই তুলে নিয়ে আয়, ডাকৃচি ব'লে। কর্তা যখন গল্প জুড়েচেন তখন ঘুমও ত ওখানে ওর হবে না, ডেকে নিয়ে এসে তোরাই বরং গল্প কর্‌।

টিয়া নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অপ্রতিভ বিব্রত ভাব দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া অতি আস্তে করিয়া প্রায় ইঙ্গিতেই যেন বলিল, কেমন জব্দ !

নবদুর্গার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙিয়া উঠিয়াছিল, সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এখন থামো ত মা। দশজনের সামনে তুমি আমাকে নাকাল ক'রে ছাড়বে ।

বাব্‌লি একেবারে যেন ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, থাক্‌ রে দুর্গা, থাক্‌ ! অতও আবার ভাল না ! মাসিমা যেন খুব অন্যায় কথা বলচেন। চ' ত টিয়া, আমরা সরোজবাবুকে দক্ষিণের ঘরেই ডেকে নিয়ে আসি ।

নবদুর্গা রাগ প্রকাশ করিতে একটা পিঁড়ি সশব্দে মাটিতে পাড়িয়া সেখানেই ঝুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। বাব্‌লি ও টিয়া পশ্চিমের ঘরের দিকেই চলিয়া গেল। নবদুর্গার রাগ ত ভানমাত্র, ভিতরে ভিতরে সে কৌতুকোচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই উচ্ছ্রিত দুই হাঁটুর মধ্যে সে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল ।

সরোজ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দক্ষিণের ঘরে আসিয়া তাই সে বলিল, আপনারা বাঁচালেন এতক্ষণে আমাকে।

—বটে!—বলিয়া বাব্‌লি চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিল, আরও বাঁচাচ্ছি আপনাকে। এতক্ষণে একবার আপনার সেই তার মুখ না দেখে বেঁচে আছেন কেমন ক'রে? দাঁড়ান, তাকেও এনে দেখাচ্ছি।

সরোজ বলিল, থাক্‌, অত ক'রে আর কাজ নেই। এই যা করেচেন এতেই আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইবার বসুন আপনারা, আপনাদের সঙ্গেই বরং গল্প করি।

টিয়া ঠাট্টার সুরে বলিয়া উঠিল, যান্‌, যান্‌, অত আর আমাদের জন্যে দরদ দেখাতে হবে না। আপনার সেটিকে ডেকে আনি আপনারা দু'জনে গল্প করুন, আমরা শুনবো।

বাব্‌লি বলিল, যান্‌, যান্‌, অত আর ভালমানুষি দেখাতে হবে না আপনাকে। আপনার মনের কথা আমরা জানি।

সরোজ অগত্যা বলিল, তবে ত জানেনই; বেশ, তাই করুন।

টিয়া আর বাব্‌লি সরোজকে সে-ঘরে রাখিয়া—পালাবেন না যেন আবার—বলিয়া নবদুর্গাকে রান্নাঘর হইতে ধরিয়া আনিতে গেল।

নবদুর্গা কি সহজে আসে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতে হইল এবং ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল সরোজের পাশে। বাব্‌লি উঠিয়া আবার দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া আসিল। নবদুর্গা আসিয়াই সেই যে ঘাড় গুঁজিল, আর সে কিছুতেই ঘাড় তুলিতে চাহিল না। সরোজ দেখিল বাব্‌লি ও টিয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন সে চকিতে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল যাহা নবদুর্গার স্বপ্নাতীত। ফস্‌ করিয়া নবদুর্গার চিবুক স্পর্শ করিয়া সরোজ বলিয়া উঠিল, তোলই না ছাই মুখখানা—কতদিন যে দেখি না ও মুখ তোমার।

বাব্‌লি ও টিয়া সরোজের কাণ্ড দেখিয়া চাপিয়া চাপিয়া তুলিয়া হাসিয়া উঠিল। সরোজও মুখ চাপিয়া হাসিল। হাসিল না নবদুর্গা—লজ্জা পাইয়া মানুষ মরে না, তাই সে মরিল না। একটু যেন কেমন কৃত্রিম কোপে ঘাড় তুলিয়া বলিয়া ফেলিল, বাবা বাবা, কি ফাজিল! য্—যাও!

টিয়া চট্‌ করিয়া বলিল, এই ত বেশ কথা কইতে পারিস্‌ দুর্গা। সরোজবাবু, আপনারটিকে কথা বলান, আমরা শুনি।

—কই গো! আবার ঘাড় গুঁজে বসলে কেন? কথা কও, ওরা তোমার কথা শুনতে এসেছে যে!—বলিয়া সরোজ মৃদু একটু হাসিল!

বাব্‌লি বলিল, বেশ, ঐসব বললেই ত দুর্গা আর কথা বলেচে। সেই সব কথা বলুন আপনি—ঐ যে—কি-না—হ্যাঁ, শুধু দুর্গাতে বুঝি মানাচ্ছিল না তাই নবদুর্গা নাম রাখতে হ'লো।

সরোজ মৃদু হাসিয়া নবদুর্গার দিকে চাহিল, নবদুর্গা মুখ সামান্য তুলিয়া বাব্‌লির পিঠে একটা চিম্‌টি কাটিয়া ভ্রূভঙ্গী করিল।

সরোজ নবদুর্গার আবার মাথা গুঁজিয়া বসিতে দেখিয়া বলিল, বে—শ! সব কথাই তবে বন্ধুদের বলা হয়েচে!

নবদুর্গা সহসা একেবারে রুখিয়া উঠিয়া বলিল, হ্যাঁ, বলা হয়েচেই ত।

তারপর আবার লজ্জায় একেবারে মুশ্‌ড়াইয়া পড়িল। টিয়া আর বাব্‌লি নবদুর্গার মুখ ঝাম্‌টি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তারপরে সরোজের নানা কথার প্যাঁচে বা টিয়া-বাব্‌লির শত অনুরোধেও আর নবদুর্গা কথা কহিতে চাহিল না। মুখ যে সে গুঁজিয়া রহিল—গুঁজিয়াই রহিল। শেষে সরোজ কৃত্রিম রোষে বলিয়া উঠিল, তবে আমি উঠি। এর চেয়ে ও-ঘরে ব'সে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গেই গিয়ে বরং গল্প করি।

নবদুর্গা মাথা নীচু রাখিয়াই ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি ভাসাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না।

টিয়া ও বাব্‌লি প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, এই ত!

নবদুর্গা কৃত্রিম লজ্জায় বাব্‌লিকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল।

সরোজ বাব্‌লি ও টিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, আপনাদের বন্ধুটিকে ভাল ক'রে মুখ তুলে কথা কইতে বলুন। নইলে এভাবে ব'সে থাকা যায় না।

টিয়া অমনি বলিল, হ্যাঁ ভাই দুর্গা, সত্যিই ত, এ তুই আরম্ভ করলি কি! খামোখা তা হ'লে সরোজবাবুকে ডেকে আনলাম কেন?

নবদুর্গা বলিল, তোরা গল্প করবি ব'লে ত ডেকে এনেচিস্, গল্প কর্।

—আমরা গল্প করবো, না, গল্প শুনবো ব'লে ডেকে এনেচি? বলিয়া বাব্‌লি নবদুর্গাকে জোর করিয়া সরোজের দিকে একটু ঠেলিয়া আগাইয়া দিল।

নবদুর্গা আবার পিছাইয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল।

ক্ষণিকের জন্য সেখানে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। এই নীরব মুহূর্ত্তে টিয়া ও বাব্‌লির মধ্যে চোখে চোখে ইসারায় কি যেন কথা হইয়া গেল। টিয়া ও বাব্‌লি একসঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাব্‌লি বলিল, বেশ, আমরা চললাম, তোরা দু'জনেই গল্প কর্। কতকাল পরে দু'জনে দেখা—আমরা কেন শাপ কুড়োই।

বলিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেছিল, নবদুর্গা টিয়ার কাপড় চাপিয়া ধরিল। টিয়া তাহা ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সরোজ বলিল, যাবেন না, গেলে কিন্তু ভাল হবে না।

টিয়া ও বাব্‌লি সত্যই ঘরের বাহিরে গিয়া ঘরের দরজাটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া শিকল টানিয়া ধরিয়া রাখিল।

কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর নীরবতা জাগিয়া রহিল, তারপরে সরোজ বলিল, বাঃ রে! এভাবে ব'সে থাকা যায় নাকি? ওদের ডেকে নিয়ে এসো।

নবদুর্গা অতি আস্তে করিয়া বলিল, বেশ হয়েচে! ফাজিল কোথাকার!

ওদের সাম্‌নে আমাকে ওভাবে জব্দ না করলে হ'তো না, না? আমি পারবো না ওদের ডাকতে।

ইহারও কিছুক্ষণ পরে টিয়া ও বাব্‌লি অকারণে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সরোজ একটু সরিয়া বসিল, নবদুর্গা বিপর্য্যস্ত ঘোম্‌টা টানিয়া তুলিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। নবদুর্গার মুখে তখন লজ্জা ও ক্লান্তি সমভাবে বিরাজ করিতেছিল।

টিয়া সহসা লক্ষ্য করিল, সরোজের গণ্ডের একপ্রান্তে খানিকটা সিঁদুর লাগিয়া রহিয়াছে। অমনি নবদুর্গার কপালের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল— নবদুর্গার কপালের সিঁদুর স্থানভ্রষ্ট ত একটু হইয়াছেই, অধিকন্তু আশে-পাশে বহুস্থানে লাগিয়া গেছে। নবদুর্গা সে-কারণেই যেন ঘোম্‌টায় যথাসাধ্য মুখ ঢাকিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা পাইতেছিল।

টিয়া রঙ্গ-বিধুর কণ্ঠে তাই বলিল, এ কি কাণ্ড করলেন সরোজবাবু! দিনে-দুপুরে এ কি কাণ্ড আপনার! রুমাল বের ক'রে শীগ্‌গির সিঁদুর পুছে ফেলুন। লোকে দেখলে পরে বলবেই বা কি! না, আপনাদের ত বিশ্বাস করা আমাদের উচিত হয় নি।

বাব্‌লি আর টিয়া একসঙ্গেই উচ্চহাস্য করিয়া সরোজ ও নবদুর্গাকে রীতিমত বিব্রত করিয়া তুলিল।

বাব্‌লি মহা বিস্ময়ে একেবারে বলিয়া উঠিল, সত্যি, এ কি কাণ্ড আপনাদের!

সরোজ রুমাল বাহির করিয়া গালের সকল দিক তাহাতে ঘষিয়া রুমালের দিকে চাহিয়া সত্যই লজ্জায় পড়িয়া গেল। টিয়া ও বাব্‌লির হাসি কিছুতেই আর থামিতে চাহে না। নবদুর্গার ইহাতে যেমন লজ্জা করিতে-ছিল তেমন আবার হাসিও পাইতেছিল। সে পট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের একটা তাক্ হইতে একটা ছোট ভাঙ্গা আরসি

আনিয়া সরোজের সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া পুনর্ব্বার ঘাড় বিশেষভাবে গুঁজিয়া বসিল।

সরোজের লজ্জার আর সীমা রহিল না, কিন্তু এভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াও সে খুশী না হইয়া পারিল না। এসব ব্যাপারে ধরা দেওয়ায় লজ্জা আছে, কিন্তু ধরা পড়িলে পর লজ্জা ডিঙাইয়া যে আনন্দের সন্ধান মেলে তাহার আর তুলনা নাই।

নবদুর্গা চলিয়া গেল। সরোজ ও নবদুর্গাকে খালের ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিতে আর সকলের সঙ্গে বাব্‌লি এবং টিয়াও আসিয়াছিল। প্রথমবার নবদুর্গা অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিল, কিন্তু এবার আর একবিন্দু চোখের জলও সে ফেলে নাই।

ইহা লইয়া টিয়া তাহাকে একটু বিদ্রূপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। নবদুর্গা ভাল হাতেই তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িয়াছে। নবদুর্গা সরোজের সাম্‌নেই একেবারে বলিয়া বসিয়াছিল—দ্যাখ্‌ টিয়া, খালের ঘাটে গা ধু'তে যাস্ যাবি তা ব'লে চিঠি লিখতে ভুলিস্ না যেন! মাইরি, তা হ'লে ভারি রাগ করবো। আর দত্ত-বাড়ীর ছেলের খবরও যেন চিঠিতে থাকে।

সরোজের সাম্‌নে টিয়া নিজেকে সহসা ভারি বিপন্ন মনে করিয়াছিল। লজ্জায় নবদুর্গার কথার আর পাল্টা জবাব দিতে পারে নাই।

টিয়া বাড়ী ফিরিয়া একান্তে এখন সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। কেন সে নবদুর্গার কথার উত্তরে জোর করিয়া কিছু বলিয়া বসিল না। কেন যে সে নবদুর্গাকে জবাব দিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিল না—কে জানে। অথচ, জবাব দিবার মত কত কথাই ত এখন তাহার মনে আসিতেছে। সরোজ কাছে না থাকিলে জবাব সে দিতে পারিত নিশ্চয়ই, কিন্তু সরোজ কাছে থাকায় জবাব দিতে না পারাটা তাহার পক্ষে

নিতান্তই অন্যায় হইয়া গেছে। তাহার পক্ষে এতখানি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। যাহা হউক, একটা কিছু জবাব দিয়া সেই লজ্জা-বিজড়িত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটিকে সহজ করিয়া তোলা তাহার খুবই উচিত ছিল এবং যে অক্ষমতা সে-মুহূর্ত্তে তাহার প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই জন্য এখন তাহাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে।

কিন্তু নবদুর্গার কথায় মধুও ত মেশানো ছিল, নহিলে এত ভালই বা তাহার লাগিল কেন। তা লজ্জা সে একটু পাইয়াছে সত্য, আনন্দও ত হৃদয়ে তাহার ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে লাভ-লোকসান তাহার দুইই হইয়াছে। আরও যাহা হইয়াছে তাহাতে টিয়া বিব্রত হইতেছিল এখনই বেশী—কারণ, সে-জিনিষটা পূর্ব্বে কখনও এমন সহজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। অর্থাৎ সুন্দরের প্রতি সে আকৃষ্ট হইয়াছে—আর সে সংবাদ গ্রামের সকলেই যেন অনায়াসে অনুমান করিতে পারিতেছে। নবদুর্গার কথায় তাহারই যেন পূর্ব্বাভাব আজ ধ্বনিয়া উঠিল! টিয়া সেই কথাই গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। ফলে খালের ঘাটে কাজ করিতে যাইতেও তাহার কেমন জানি আজ বাধিতে লাগিল। রায়েদের দীঘিতেই তাহাকে আজ তাই গা ধুইতে এবং জল আনিতে বৈকালের দিকে একা একা যাইতে হইল। বাব্‌লিকে ডাকার সাহসও তাহার আর হইল না। কি জানি, বাব্‌লি যদি আবার দীঘিতে যাওয়া লইয়া কোন বিদ্রূপ করিয়া বসে, কিংবা নবদুর্গার সকালের কথাটারই টীকা সমেত ব্যাখ্যা সুরু করিয়া দেয়! সে এখন একা একাই তাই দীঘিতে গেল।

দীঘি হইতে ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্বেই। বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই সহসা পিতার কথা শুনিয়া টিয়ার মনে হইল, ফিরিয়া না আসাই যেন তাহার উচিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে এমন কোন সংকল্প লইয়া ত আর সে দীঘিতে যায় নাই, তবে আর একটু আগে-পরে আসিলেই ত

ভাল হইত। পিতার অধুনা-উচ্চারিত দুর্ব্বাক্য কানে তাহার না গেলেই ভাল ছিল। এমন অস্বস্তি তাহা হইলে তাহাকে আর ভোগ করিতে হইত না।

বাক্য সামান্যই, কিন্তু অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করিল টিয়ার চিন্তা-কাতর মনে।

টিয়া যখন সন্ত্রস্তপদে বাড়ীর উঠানে পা বাড়াইল তখনই ঠিক নিশি সজ্জন উঠানে দাঁড়াইয়া দাওয়ায় উপবিষ্টা রূপসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছিল, এই এক মেয়ে থেকেই আমার সর্ব্বনাশ হবে! দু-দশ গাঁয়ের মধ্যে সজ্জন-বাড়ীরই এতকাল কোন কলঙ্ক ছিল না—তাও এবার হবে। সজ্জন-পরিবারের যশ-খ্যাতি সবই এবার ডুবতে বসেচে। না, সে আমি হ'তে দেবো না, কিছুতেই না। আর তা বন্ধ করতে যদি মেয়েকে আমার নিজ হাতে খুন করতে হয় ত তাও আমি করবো। শেষকালে মধু ঘোষাল—ঐ চামারটা কিনা ঠারে আমাকে কথা শোনালে? বলে কি-না—'মেয়েটি ত বেশ ডাগর হয়েচে ব'লেই আমরা মনে করি সজ্জন, এইবার পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করো। আর ব্যবস্থা ত মেয়েই ক'রে তুলেচে শুনতে পাই। দাও, সেখানেই দাও, পাত্রটি ভালই ত; মেয়েও তোমার সুখে থাকবে, আর চোখের সামনেই থাকবে। পারাপারের জন্য দু বেয়াই-এ আধাআধি বখ্‌রা দিয়ে একটা সাঁকো শুধু বেঁধে নিলেই চলবে। আমরাও দেখে খুশী হ'তে পারবো যে, এতকালের এত শত্রুতা দু বাড়ীতে শেষ হ'লো শেষ পর্য্যন্ত গাঁটছড়া বেঁধে।' শেষে মধু ঘোষালের কথা পর্য্যন্ত আমাকে দাঁড়িয়ে শুনতে হ'লো। না, আর না! কালকেই আমি কাম্‌লা ডেকে ঘাটে বেড়া তুলে দিচ্ছি। এখানেই এর শেষ হোক্, নইলে কলঙ্কিনীর খালে আবার রক্তগঙ্গা বইয়ে তবে সজ্জন-বংশের পরিচয়।

টিয়া চকিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সমস্তই সে শুনিল। শুনিয়া নির্ভীক হইয়া উঠিল এবং অচিরে উঠানেই যে রক্তগঙ্গা বহিয়া গিয়া সজ্জন-বংশের পরিচয় বাহাল থাকিতে পারে তাহা আশঙ্কা করিয়াও উঠানের

মাঝ দিয়া নিশি সজ্জনের রোষদীপ্ত দৃষ্টি কাটিয়া রান্নাঘরের দিকে জল লইয়া ভিজা কাপড়েই সহজ সজীব গতিতে চলিয়া গেল।

আশ্চর্য্য! নিশি সজ্জন একটা কথাও কহিল না, যদিও টিয়া তাহার সম্মুখ দিয়াই অশঙ্কিত চিত্তে চলিয়া গেল। না কহিবার কারণও আছে। নিশি সজ্জন একটু বিচলিত হইয়াই পড়িয়াছিল। টিয়ার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সে যে এতক্ষণ রূপসীর কাছে এভাবে টিয়ারই অপযশ-কীর্ত্তন করিতেছিল তাহারই অন্যায় তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। টিয়া বুঝি আবার তাহা শুনিয়াও গেল। নিশি সজ্জন তাহারই দুশ্চিন্তায় আরও বিচলিত হইয়া উঠিল।

টিয়া রান্নাঘরে জলের কলসী নামাইয়া দিয়া আবার উঠানে নামিয়া আসিল। কিন্তু নিশি সজ্জন ততক্ষণে উঠান ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। দাওয়ায় কিন্তু রূপসী তখনও বসিয়াছিল।

টিয়াকে উঠানে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া এবং স্বামী সেস্থান মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিল, আহা-হা! ম'রে যাই পুরুষ-মানুষের সাহস দেখে! আর পুরুষ-মানুষ এমন না হ'লে কি কখনও ঘরের মেয়ে করে দাপটের সঙ্গে শত্রুতা! আরও না জানি অদৃষ্টে কত হেনস্থাই লেখা আছে!

টিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া গেল।

পরদিন বেড়া উঠিল। কলঙ্কিনীর খালে সজ্জন-বাড়ীর ঘাট দাবনার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়া পর্দ্দানশীন ঘাট করিয়া তোলা হইল। আর এমন করিয়া ঘাট ঘেরা হইল যে, বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর ঘাট হইতে এ-ঘাটের কিছুই প্রায় দেখা যাইতেছিল না। ঘাট বেড়া দিয়া ঘিরিতে প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। নিশি সজ্জনের বুকের নিশ্বাস কথঞ্চিৎ হাল্কা হইয়া আসিল।

টিয়া আয়োজন দেখিয়া মনে মনে হাসিল, কিন্তু ভয়ও সে পাইল। পিতার মনে সন্দেহের আগুন জ্বলিয়াছে, রূপসী যথারীতি তাহাতে ইন্ধন যোগাইবে, সে অনলে না পুড়িয়া তাহার আর নিস্তার নাই।

সুন্দর সহসা তাই আজ তাহার চোখে মুহূর্ত্তে অপার্থিব, দুর্লভ ও অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং এই অদ্বিতীয়ের জন্য পুড়িয়া মরিতে পারিলেও যেন অনন্ত শান্তি বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিল। টিয়া তাই মরণ মানিয়া লইল, কিন্তু আমরণ বিক্ষোভ মানিয়া লইতে পারিল না।

সুন্দর সকালে বাড়ী ছিল না। শ্রীমন্তকে সঙ্গে লইয়া বকফুলীর ওপারে গিয়াছিল বিশেষ কি যেন কাজে। কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে তাহার অনেক বেলা হইয়া গেল। শ্রীমন্তকে তাহাদের বাড়ীর ঘাটে নৌকা হইতে নামাইয়া দিয়া সুন্দর নিজেদের ঘাটে আসিয়া সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের নূতন রূপ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত হইয়া রহিল এবং পর মুহূর্ত্তেই তাহার বিপুল হাসি পাইল। সজ্জন-বাড়ীর ঘাটে সহসা আজ যে বেড়া উঠিল কেন—তাহা সে ভাবিয়া না পাইলেও একথা সে বুঝিল যে তাহারই কারণে ও-ঘাটে বেড়া উঠিয়াছে। কিন্তু কারণটা সঠিক সে ধারণায় আনিতে পারিতেছিল না। রূপসী সজ্জন-বাড়ীতে আজ নূতন আসে নাই, এতকাল সে বেড়া-হীন ঘাটেই প্রয়োজনে আসিয়াছে, কাজেই তাহার অসুবিধার জন্য আর বেড়া ঘিরিয়া ঘাট ঢাকা হয় নাই। হইয়াছে অবশ্য টিয়ার জন্যই! টিয়ার বয়স হইয়াছে, কিন্তু বয়স হওয়াই যথেষ্ট কারণ এক্ষেত্রে হইতে পারে না। আরও কি যেন তবে ঘটিয়াছে। হইতে পারে তাহার চোখ হইতে টিয়াকে আড়াল করিয়া রাখিবার জন্যই নিশি সজ্জনের এ ব্যর্থ প্রয়াস। কিন্তু সে যাহাই হউক, সুন্দরের বেশ লজ্জা করিতে লাগিল ; ঘাটে বেড়া উঠিয়াছে

বলিয়াই নয়, সেদিন সে যে সজ্জন-বাড়ীর ভিটায় পা দিয়াছিল, আর টিয়ার সঙ্গে কথা বলিতে যখন ব্যস্ত তখন যে রূপসীর কাছে তাহারা ধরা পড়িয়াছিল—সেই কারণেই। হইতে পারে সেই ঘটনাকেই সূত্র করিয়া বহু ঘটনার আলোচনা এবং তাহারই ফলে সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের এ আব্রু-ঘেরা রূপ।

সুন্দর লজ্জায় তাই হাসিয়া ফেলিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ডাঙায় উঠিয়া গেল পিছন দিকে একবারও দৃষ্টি না ফেলিয়া।

ব্যাপারটা সুন্দরকে বেশ ভাবাইয়া তুলিল। স্নানাহার সারিতে তাই তাহার বেলা একেবারে গড়াইয়া গেল এবং স্নানাহার সারিয়াই সে ডাঙা-পথে শ্রীমন্তের বাড়ী গেল। শ্রীমন্ত তখন নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। শ্রীমন্তের চোখ তখন নিদ্রায় ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সুন্দর তাহাকে স্বস্তিতে নিদ্রা যাইতে দিল না। সজ্জন-বাড়ীর নূতন কীর্ত্তির কথাই সে তাহাকে শুনাইতে লাগিল।

শ্রীমন্ত সমস্ত শুনিয়া মৃদু একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, এখন থেকে সজ্জন-বাড়ীতে একটা কাকপক্ষীও যদি ডাকে ত বুঝতে হবে যে সে তোরই কারণে। তোর যেমন কথা! এমনও ত হ'তে পারে যে খাল দিয়ে বেপারীদের নাও আজকাল খুব বেশী চলচে ব'লে ঘাটে বেড়া দিয়েচে।

সুন্দর বলিল, না, সে হ'লে বহু আগেই বেড়া উঠতো।

শ্রীমন্ত বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ'লো—তোরই জন্যে বেড়া দিয়েচে। আর দেবেই বা না কেন, টিয়ার ত বয়েস হয়েচে। তোর চোখের সামনে যখন তখন আসতে দেবে কেন শুনি? বেশ করেচে, ভালই করেচে।

সুন্দর ম্লান একটু হাসিয়া বলিল, আমি ত ভাল-মন্দের কথা কিছু বলিনি, তুই চট্‌চিস্ কেন?

শ্রীমন্ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, চটবো-না-ই বা কেন শুনি? বাবা,

বাবা, পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র শুনি তোর আর টিয়ার কীর্ত্তিকলাপ, আবার তোর কাছেও একতরফা দিবারাত্রি, সারা সকাল ত জ্বালিয়েচিস্, আবার এসেচিস জ্বালাতে—ঐ এক কথা, টিয়া আর টিয়া। না চ'টে মানুষ পারে ?

সুন্দর ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। কারণ শ্রীমন্তকে সে চেনে। ইহা তাহার মনের কথা না, তাহাকে বিব্রত করার জন্যই এভাবে তাহার বলা।

সুন্দর তাড়াতাড়ি বলিল, আচ্ছা, আসি তবে।

সুন্দর অভিমানের ভান করিয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইতেই শ্রীমন্ত ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া তাহার গতি রোধ করিল। বলিল, ছেলেমানুষি আর করতে হবে না সুন্দর। রাগ দেখিয়ে আর চ'লে যেতে হবে না।

সুন্দর আবার আসিয়া বসিল।

শ্রীমন্তের কাছে সুন্দরের কোন কথাই আর গোপন ছিল না। সুন্দরের সকলপ্রকার দুর্ব্বলতার সঙ্গে শ্রীমন্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহা সত্ত্বেও সুন্দর কতভাবে কতবার যে এই একই ঘটনার বিবৃতি শ্রীমন্তের কাছে সুযোগ পাইলেই করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই, তথাপি সুন্দরের কথা আর শেষ হয় না; বলিয়াও মনে হয়, বুঝি-বা বলা হইল না। শ্রীমন্ত তাহার কথা শুনিয়া কখনও বিদ্রূপ করে; কখনও হাসিয়া জিনিষটাকে তরল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, কখনও আবার বুদ্ধি-পরামর্শ প্রয়োজন মত দেয়, কখনও আবার হয় ত শুনিয়া নীরব থাকে—কোন ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইতে দেয় না। সুন্দরকে লইয়া রঙ্গ করিতে শ্রীমন্তের বেশ লাগে, আর অধুনা তাহা অতি সহজ হইয়াও উঠিয়াছে।

রঙ্গ-কৌতুকে বহু সময় কাটাইয়া দিয়া সুন্দর ও শ্রীমন্ত উঠিল।

বেলা তখন একেবারে গড়াইয়া গেছে। শ্রীমন্তকে সুন্দর সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের বেড়া দেখাইতেই লইয়া চলিল।

ওপারে টিয়া বাতাবি লেবু গাছটার একটা ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘাটে তাহার কাজ ছিল, কিন্তু ঘাটে তখনও সে নামে নাই। ঘাটটুকু শুধু বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল, কাজেই পাড়ে দাঁড়াইলে অপর পার অতি স্পষ্টই দেখা যায়। শ্রীমন্ত ও সুন্দর টিয়াকে স্পষ্টই দেখিতে পাইল। টিয়া প্রথম তাহাদের দেখিতে পায় নাই, যেহেতু সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল ; পরে যখন তাহাদের প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে অনাবৃত বলিয়া বোধ করিল তখনই লজ্জায় মুখ ফিরাইল এবং পলাইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইবে কি-না তাহাই বিচার করিতে লাগিল। কিন্তু কাজটা সহসা করিতে পারিলেই ভাল ছিল, পরে আর সম্ভব হইল না, পলাইয়া যাইতে কেমন জানি সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল।

সুন্দর শ্রীমন্তের অতি কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও উচ্চকণ্ঠে টিয়াকে শুনাইবার জন্যই বলিয়া উঠিল, শ্রীমন্ত, কালই আমাদের ঘাট বেড়া দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি। আমাদের ঘাটই বা বে-আব্রু থাকতে যাবে কেন শুনি ? আমাদের কি মান-সম্মান ব'লে কিছু নেই ?

টিয়া সুন্দরের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল, শ্রীমন্ত প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, হুঁ, ঘাটে বেড়া দিলেই যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যেত ত আর ভাবনা ছিল কি!

শ্রীমন্ত উচ্চকণ্ঠেই কথাগুলি বলিল, টিয়ার কানেও সে কথা গেল। সুন্দর তাই ততোধিক উচ্চকণ্ঠে বলিল, হুঁ, লোকের মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমার তো চোখে ঘুম নেই।

টিয়া আর দাঁড়াইল না। আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকেই পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কান তাহার পিছনেই পড়িয়া রহিল—এখনই একটা মন্তব্য হইবে আশায়।

সুন্দর বলিল, ব্যস্, তাড়ালি ত ?

শ্রীমন্ত হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ডেকে ফেরালেই পারিস্। এটুকুও এতদিনে পারিস্ না ? লোকে তবে এত কথা খামোখাই বলে ?

সুন্দর কিছু বলার পূর্ব্বেই টিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্ত পরেই আবার ঘাটে নামিয়া গেল।

শ্রীমন্ত তখন উচ্ছ্বাসবিধুর হইয়া হাসিয়া সুন্দরের গায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, দেখলি ত তীর ঠিক বিঁধে গেচে পাখীর ডানায়—আর কি পালাতে পারে কখনও।

টিয়া ঘাটে বসিয়া অকারণে জলে হাত ডুবাইয়া ঘটা করিয়া আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুন্দরের মনে হইল, ঘাটের বেড়ার গায়ে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিলে মন্দ হয় না। কিন্তু আজ আর তাহা সম্ভব হইল না। শ্রীমন্তের কাছে অতখানি বাড়াবাড়ি করিতে তাহার বাধিল।

এককালে লোকের মুখে শিখীপুচ্ছের সজ্জন-বাড়ী ও বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর বিরোধের নানাবিধ কাহিনী নিত্য নূতন শুনা যাইত, যেখানে-সেখানে তাহা লইয়া হইত বিচিত্র আলোচনা, ভাল-মন্দের বিচার এবং বীরত্বের ব্যাখ্যা চলিত, নানা ভাষা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া। বহুকাল সে সব আর লোকে শোনে নাই, কারণ দুই বাড়ীর বিরোধ এযাবৎকাল একপ্রকার অন্তরেই ঝিমাইয়া ছিল, বাহিরে প্রকাশ কিছু পায় নাই। অধুনা আবার দুই বাড়ীর নাম লোকের মুখে একত্রে শুনা যাইতেছে, কিন্তু বিরোধ-শত্রুতার বালাই তাহাতে নাই, আছে—আসন্নপ্রায় পরম মিত্রতার আভাস। তাহারই দরুণ দেখা দিয়াছে গোলমাল। শত্রুতার মধ্যে আছে পৌরুষ—সবল মনের দ্বিধাহীন প্রকাশ, কিন্তু মিত্রতার মধ্যে আছে ঘন দুর্ব্বলতা—যেন পরাজয়ের গ্লানি এবং তাহারই দরুণ ভয়-ভীতি যাহা

কিছু দেখা দিয়াছে কন্যার পিতা নিশি সজ্জনের মনে। এক্ষেত্রে একমাত্র তাহারই পরাজয় সম্ভব; অগৌরব যদি কিছু কাহাকেও স্পর্শ করে ত তাহা করিবে নিশি সজ্জনকেই। দুর্ভাবনাও অন্তরে তাই তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আবার শত্রুতা সুরু হউক, আবার কলঙ্কিনীর খাল রক্তে রক্তে লাল হইয়া উঠুক; এমন কি, তাহার নিজের রক্তেও যদি কলঙ্কিনীর খালের জল লাল হইয়া ওঠার প্রয়োজন দেখা দেয় ত দিক্, কিন্তু এপারে-ওপারে যাতায়াতের জন্য যে সাঁকো বাঁধা—তাহা অসম্ভব!

নিশি সজ্জন তাই ঘাটে বেড়া তুলিয়াই আর ক্ষান্ত রহিল না। গ্রামে গ্রামে সৎপাত্রের সন্ধান লইতে লাগিয়া গেল। টিয়ার বয়স হইয়াছে—বিবাহের আর বিলম্ব করা উচিত না। আর অযোগ্য পাত্রেও ত টিয়াকে সমর্পণ করা সম্ভব হয় না—লোকেই বা বলিবে কি! শেষ পর্য্যন্ত হয় ত বলিবে যে, নিশি সজ্জন দ্বিতীয় পক্ষের পরামর্শে মেয়েটাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছে। চট্ করিয়া আর ভাল পাত্রের সন্ধানই বা মেলে কোথা হইতে, সামান্য বিলম্ব না করিয়াও ত উপায় নাই। কিন্তু বিলম্ব না করিতে হইলেই যেন ছিল ভাল। নিশি সজ্জন এই কারণে নিজেকে সহসা বিশেষ বিপন্ন মনে করিল। কিন্তু বিবাহের আর বিলম্ব করা চলে না কোন-মতেই। গ্রামের লোকের মুখ বন্ধ করিতে হইলে টিয়ার যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। আগামী অগ্রহায়ণে দিতে পারিলেই সে স্বস্তি পায়।

এদিকে আবার পূজা প্রায় আসিয়া গেল। নিশি সজ্জন দশভূজা মায়ের পূজার আয়োজনের ভাবনাই ভাবিবে, না টিয়ার বিবাহের কথাই ভাবিবে? এ দুইটির একটিও যে স্থগিত রাখিবার উপায় নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল নিশি সজ্জন ততই গুরুভার চিন্তাক্রান্ত হইতে লাগিল।

রূপসী কেন জানি টিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ-নির্লিপ্ত রহিল।

কিন্তু টিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে নিশি সজ্জনের প্রচেষ্টা দেখিয়া সে খুশীই হইল। টিয়ার কোন শুভাশুভের জন্য রূপসীর কিছুমাত্র মাথা-ব্যথা কোন দিনই ছিল না, আজিও দেখা দেয় নাই ; তবে টিয়া যে অন্য কোন ঘরের মানুষ হইয়া যাইবে এবং সে যে নিষ্কণ্টক হইয়া সজ্জন-বাড়ীর মধ্যে নিজ খেয়াল-খুশী বজায় রাখিয়া বসবাস করিতে পারিবে কাহারও চোখে কিছুমাত্র না বাধিয়া তাহারই সুখ-কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই টিয়ার বিবাহ হইয়া যাওয়ার দিকে তাহার একটা আন্তরিক আগ্রহ বিদ্যমান ছিল।

কাজেই নিশি সজ্জন সেদিন যখন রূপসীর কাছে টিয়ার বিবাহের কথা তুলিয়া বসিল, তখন রূপসী কথা কওয়া বা মতামত দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না এবং নীরব থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। নিশি সজ্জন কোথায় কোথায় পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং কাহার কি যোগ্যতা তাহা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া রূপসীকে একবার প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কোন্ পাত্রটিকে তোমার পছন্দ হয় শুনি ?

রূপসী প্রথম ভাবিল, মতামত কিছু না দেওয়াই ভাল। কিন্তু কথা না বলিয়াও কেন জানি সে থাকিতে পারিল না। কাজেই বলিল, তা সে তুমি মেয়েকে জিগ্যেস্ করলেই পারো। আমার মতামতে আসবে যাবে কি শুনি ?

নিশি সজ্জন ইহাতে নিজেকে সামান্য বিব্রত মনে করিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই আবার সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বলিল, এ আমার মস্ত দায়িত্ব—পরে এ নিয়ে অনেক কথাই উঠতে পারে। কাজেই দশজনের মতামতের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

রূপসী ইহাতে বিরক্ত বোধ করিয়া বলিল, আমার মতামতের ওপর নির্ভর না করলেও তোমার চলবে। মতামত দিয়ে কি শেষে নিজেকে দোষের ভাগী করবো নাকি ? তা দোষ ত লোকে আমাকেই

দেবে—তা দিক গিয়ে। ওসব আমি গ্রাহ্যি করিনে। ভাল আমার কেউ দেখবে না সে আমি জানি। কপাল আমার মন্দ—কে তা খণ্ডাবে বলো!

নিশি সজ্জন এত কথার পরেও বলিল, তবু?

রূপসী একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, মেয়ে ত আমার নয় যে আমার কথায় কাজ হবে। মেয়ে তোমার—তুমি যেখানে খুশী তাকে বিয়ে দেবে। আমি এ-ব্যাপারে সাতেও নেই—পাঁচেও নেই।

—আচ্ছা!—বলিয়া নিশি সজ্জন রূপসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল এবং মনে মনে ঠিক করিল, আর কখনও টিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে রূপসীকে সে জড়াইতে চাহিবে না। রূপসীর মতামতের প্রয়োজনও এক্ষেত্রে কিছু নাই বলিয়াই এখন তাহার মনে হইতে লাগিল। একথা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলে তাহাকে রূপসীর কাছে এমন অপ্রস্তুত হইতে হইত না। সে কারণে নিশি সজ্জন মনে মনে আফশোষই করিল। অবশ্য, রূপসীর আচরণে আফশোব তাহাকে বহুদিন করিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিতে হইবে তাহা সে জানে, কাজেই ভাবিয়া কিছু আর লাভ নাই।

মুখের কথা—দশজনের কানে উঠিতে উঠিতে সুন্দরের কানেও উঠিল। টিয়ার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে, পাত্রের সন্ধান করা হইতেছে। সুন্দর সহসা বেশ বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু বিচলিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণও সে খুঁজিয়া পাইল না। টিয়ার বয়স হইয়াছে, টিয়ার জন্য পাত্রের সন্ধান ত তাহার পিতাকে করিতেই হইবে। ইহা ত সহজ কথা! কিন্তু পাত্রের জন্য সন্ধান না চলিলেই যেন সে খুশী হইত, ভাবনার তাহার কিছু থাকিত না। অথচ ভাবনাও যে এক্ষেত্রে অসঙ্গত তাহাও সে মনে মনে বুঝিল।

রাত্রে হাজারখুনীর বিলে নৌকার 'পরে বসিয়া শ্রীমন্ত ঠিক এই কথাই তুলিল সুন্দরকে বিশেষ করিয়া ভাবাইয়া তুলিবার জন্য। সুন্দর শ্রীমন্তের কথা শুনিয়া বিশেষ ভাবিত হইল না, কারণ ভাবনা তাহার পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল। কাজেই নিঃস্পৃহকণ্ঠে বলিল, বিয়ের বয়স হয়েচে, পাত্রের সন্ধান ত চলবেই। সেকথা শুনে আমার লাভ?

শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ-চতুরকণ্ঠে বলিল, তোর লাভের কথা নয়, লোকসানের কথাই বলা হ'চ্ছে।

সুন্দর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, নারে শ্রীমন্ত, লোকসান কিছু নয়। টিয়ার খুব ভাল বিয়ে হোক্, তাইই আমি চাই।

শ্রীমন্ত সুন্দরের কণ্ঠে তাহার নিজেরই অন্তরের সুর প্রতিধ্বনিত দেখিয়া ব্যথিত হইল, কিন্তু ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িল না। বলিল, কি চমৎকার তোর স্বার্থত্যাগ সুন্দর! কেন, দত্ত-বাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কি খুব ভাল বিয়ে হয় না?

—না, হয় না। তুই চুপ কর্ এখন।—বলিয়া সুন্দর অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিল।

শ্রীমন্ত সুন্দরকে ঘুরিয়া বসিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিল। তার-পরে বলিল, তা আমার ওপর রাগ করিস্ কেন সুন্দর? বেশ, একথা না হয় নাই তুললাম আর। কিন্তু টিয়ার সঙ্গে অন্য কারও বিয়ে হবে এ যেন আমি ভাবতেই পারি না। আর টিয়াই কি তাতে রাজি হবে নাকি? সেই দেবে দেখিস্ বাধা।

সুন্দর সহসা আবার ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, হুঁ, বাধা দেবে না ছাই! আর কেনই বা সে বাধা দেবে, কিসের তার গরজ! না, উচিত হবে না তার বাধা দেওয়া। সজ্জনবংশের রক্ত ত ওরও শরীরে আছে, ও-ই বা শত্রুতা কম করবে কেন বনপলাশীর দত্তদের সঙ্গে? হোক্, ভাল ক'রেই তবে আবার শত্রুতা সুরু হোক্।

সুন্দরের কথায় শ্রীমন্ত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তোর হ'লো কি সুন্দর? কিসের শত্রুতা সুরু হবে শুনি?

—হবে, হবে, সে তুই বুঝবি না।—বলিয়া সুন্দর নীরব হইল।

শ্রীমন্ত উচ্চহাস্য করিল। চেষ্টা না করিয়া অমন উচ্চহাস্য মানুষের দ্বারা সম্ভব হয় না। সুন্দর তাই বিশেষ বিব্রত হইল।

পূজা আসিয়া গেল। কুমোর প্রতিমা গড়িতে লাগিল। দত্ত-বাড়ীর প্রতিমার একমাটি শেষ হইয়া গেল, তবুও সুন্দরের মনে কেন জানি কোন উৎসাহ-উদ্যম কিছুই দেখা দিল না। প্রতি বৎসর যে অপরিমিত উৎসাহ উদ্যম-আনন্দ বৎসরের এই সময়টায় তাহার অন্তরে জাগিয়া থাকিত তাহা এ-বৎসর সহসা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেছে। শ্রীমন্তই তাহা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ তাহার জানাই ছিল, কাজেই সে আর সুন্দরকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিয়া উত্যক্ত করিল না। সুন্দর তাহার কর্ত্তব্য কাজ সমস্তই করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই তাহার তেমন আন্তরিকতা ছিল না। এমন কি এ-বৎসরে পার্ব্বতীচরণ যে কেমন প্রতিমা গড়িতেছে তাহাও সে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিল না। একটি-বারও সে আর আর বৎসরের মত পার্ব্বতীচরণকে প্রতিমা যাহাতে দু-দশ গ্রামের মধ্যে সেরা প্রতিমা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনওপ্রকার অনুরোধ করিল না, একটা কথাও বলিল না।

শেষে পার্ব্বতীচরণই একদিন বলিল, হ্যাঁগো দাদাবাবু, এবার ত কই একবারটিও আমার পাশে বসলে না। এটা হ'লো না, সেটা হ'লো না, ভাল-মন্দ কই একটা কথাও ত এবার বললে না। এবার বুঝি আর সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমার সঙ্গে কোন আড়াআড়ি নেই, ভাল-মন্দ যাহোক্ একটা হ'লেই হ'লো বুঝি?

সুন্দর বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল। তাই তো, এবার তো সে

একবারও পার্ব্বতীচরণকে স্মরণ করাইয়া দেয় নাই যে, তাহাদের প্রতিমা যেন সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা অপেক্ষা ভাল হয়, নহিলে দত্ত-বাড়ীর মান-কান আর থাকিবে না। তাড়াতাড়ি কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সুন্দর বলিল, পার্ব্বতী-দা, সেকথা কি আবার নতুন ক'রে তোমাকে ব'লে দিতে হবে নাকি? আর সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা ত গড়ছে শশী কুমোর—সে আবার নাকি পাল্লা দেবে তোমার গড়া প্রতিমার সঙ্গে! কাজেই বলার কিছু প্রয়োজন দেখিনে।

সুন্দরের কথায় পার্ব্বতীচরণ খুশী হইয়া গেল। প্রতি বৎসর সজ্জন-বাড়ীর প্রতিমা শশী কুমোরই গড়িয়া থাকে এবং পার্ব্বতীচরণের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রাণান্ত পরিশ্রমও করে, কিন্তু কোনও বৎসরই প্রতিমা তাহার পার্ব্বতীচরণের গড়া প্রতিমার সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। এ অঞ্চলে পার্ব্বতীচরণের গড়া প্রতিমার খ্যাতি আছে। পার্ব্বতীচরণ সুন্দরের কথায় তাই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া বলিল, হ্যাঁ, শশী গড়বে প্রতিমা আর সেই প্রতিমা কি-না পাল্লা দেবে আমার গড়া প্রতিমার সঙ্গে! তা যা বলেচো দাদাবাবু! আর আমরা হ'লেম সাতপুরুষে-কুমোর দাদাবাবু—নূপুরগঞ্জের আদি কুমোর হ'লেম আমরা। আর শশী ত তা নয়—ওর সাত পুরুষে কেউ কখনও রং-মাটি এক করেনি। খেতে পেত না ওর বাবা—ফ্যাঁ ফ্যাঁ ক'রে ঘুরে বেড়াত—তাই দাদাম'শায় আমার হাতে ধ'রে—তাকে কাজ শিখিয়ে গেচ্‌লো—সেই সূত্রে হ'লো কুমোর। তবেই বোঝো দাদাবাবু—বলিয়া পার্ব্বতীচরণ খুব প্রগল্‌ভ হাসি হাসিতে লাগিল। সুন্দর একথা ইতিপূর্ব্বে আরও বহুবার পার্ব্বতীচরণের মুখেই শুনিয়াছে, কাজেই ইহার মধ্যে আর নূতনত্ব কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না। তথাপি পার্ব্বতীচরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে বলিল, তাই না পার্ব্বতী-দা, তোমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রতিমা গড়া! কথায় বলে না

বংশের ধারা! সে আর শশী পাবে কোথায়! কিন্তু শশীরও হাত দিন দিন পাকচে ত?

পার্ব্বতীচরণ মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, লোহার ছুরিতে যতোই কেন না শাণ দেওয়া যাক্, ইস্পাতের ছুরির কাছে কি আর সে কিছু?

সুন্দর বলিল, কিছু নয়ই ত। সেজন্যেই ত আমি নিশ্চিন্ত আছি পার্ব্বতী-দা।

পার্ব্বতীচরণ খুশী হইয়াই বলিল, হাঁা, তা নিশ্চিন্তই থাকো দাদাবাবু।

সুন্দর যথাসম্ভব অল্প কথায় পার্ব্বতীচরণকে বিদায় করিয়া দিয়া খালের ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। আজ সুন্দরের পিতা ভৈরব দত্তের পূজার বাজার লইয়া বাড়ী আসার কথা আছে এবং সময়ও প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রতি বৎসর ভৈরব দত্ত তাহার ব্যবসার স্থল হইতে এই সময় পূজার যাবতীয় বাজার সারিয়া একটি বৃহৎ নৌকায় সমস্ত জিনিষপত্র চাপাইয়া বাড়ী ফেরে। পিতার নৌকার আগমন প্রতীক্ষায় খালের ঘাটে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল যেন কতকটা পার্ব্বতীচরণের কথার সত্য অপ্রমাণ করিতেই, কিন্তু অপর পারের ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মন তাহার কেমন একপ্রকার ভীরু শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মনে তাহার একবিন্দু উৎসাহ-আনন্দ নাই, আর সেকথা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই জানিয়া ফেলিয়াছে; এমন কি, পার্ব্বতীচরণও জানিয়াছে। সুন্দর কি যে করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময় ওপারের লেবু গাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—রূপসী।

সুন্দর দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

আবার দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেই সে দেখিল, রূপসীর ঠিক পশ্চাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—টিয়া ও বাব্‌লি। তিনজনেরই সদ্য-স্নাত মূর্ত্তি। সুন্দর সহজেই বুঝিল যে, পূজার কোন কাজেই হয় ত তাহারা ঘাটে আসিয়াছে। অল্প পরেই দেখা দিল মনোহর। সুন্দর আর সেখানে

দাঁড়াইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়াই বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু কেন যে চলিয়া গেল তাহা নিজেও সে ভাল করিয়া বুঝিল না।

আবার মনোহরের কণ্ঠ।

টিয়া চম্‌কাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। রূপসী ও বাব্‌লিও ফিরিয়া দাঁড়াইল। মনোহর এইমাত্র আসিয়াছে।

মনোহর বলিল, পূজো ত তা হলে লেগেই গেল দেখতে পাই। আজ থেকেই ত প্রতিমার রং চড়বে শুনে এলাম শশীকুমোরের মুখ থেকে। ব্যস, এইবার বাজনা বেজে উঠলেই ত পুরো পূজো লেগে ওঠে আর কি! কেমন কি-না দিদি? ভাবলাম তাই, দু'টো দিন গিয়ে থেকেই আসি শিখীপুচ্ছে, পূজোর ক'দিন ত আবার নানা ঠাঁই পালা গেয়ে বেড়াতে হবে কি-না, ছুটি আর মিলবে না।

রূপসী বলিল, তা বেশ। তুই এখন ঘরে গিয়ে বোস্, আমরা ঘাট থেকে কাজ সেরে আসচি।

রূপসীর কণ্ঠে আজ এই প্রথম কেন জানি একটু দরদ দেখা দিল। মনোহর কিন্তু তাহা লক্ষ্যও করিল না। সে অপলক দৃষ্টিতে টিয়ার দিকে চাহিয়া ছিল—চাহিয়াই রহিল এবং বলিল, টিয়া, তুমি দেখতে পাই ভীষণ রোগা হ'য়ে গেচো, অসুখ-বিসুখ করেছিল বুঝি?

এইবার রূপসী মনোহরের উপর চটিল। তাহার দরদ দেখানো তবে বৃথা হইয়া গেল! মনোহরের চক্ষে তাহার কোন সমাদর হইল না। সে টিয়াকে লক্ষ্য করিতেই ব্যস্ত। কাজেই রূপসী এবার একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলিল, যা দিকি বাপু এখন এখান থেকে, আমাদের হাতে অনেক কাজ। গাল-গল্প যা করতে হয় সেজন্যে ত সারাদিন প'ড়ে রয়েচে। ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠে বোস্—আমরা কাজ সেরেই আসচি।

মনোহরের আর দাঁড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না, কাজেই সে নিতান্ত

অনিচ্ছা সত্বেও বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। টিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তেই আবার সে দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া উঠিল। একে ত মন তাহার ভাল নয়, তাহাতে আবার মনোহর—সেই বিরক্তিকর মনোহর আসিয়া জুটিল। সারা দিন হয় ত পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইবে, এককথাই হয় ত বিনাইয়া বিনাইয়া পঞ্চাশবার বলিবে এবং সর্ব্বশেষে সেই চরম বিরক্তিকর কথাই হয় ত কহিবে—আমাকে তুমি যাত্রার দলের ছেলে ব'লে মোটে দেখতে পারো না টিয়া।

টিয়ার আর ভাল লাগে না। মনোহরকে সত্যই তাহার ভাল লাগে না। মনোহর যাত্রার দলের ছেলে বলিয়া টিয়ার কোন বিদ্বেষ নাই, কিন্তু মনোহরের অকারণ অন্তরঙ্গতা তাহাকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তোলে, তাহার বিশ্রী লাগে। মনোহরকে সেকথা বুঝাইয়া বলাও চলে না। কাজেই মনোহরের প্রতি টিয়ার ব্যবহারে অধুনা কেমন একটা জড়তা আসিয়া গেছে। সে-কারণে মনোহরের আগমন টিয়ার কাছে আরও বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপায় নাই, মনোহরকে ক্ষুণ্ণ করাও চলে না। টিয়াকে অনেক কিছুই সহ্য করিতে হয়, মনোহরের অসঙ্গত অন্তরঙ্গতাই বা সে সহ্য করিবে না কেন। টিয়া তাই যথাসাধ্য নিজের মনোভাব অপ্রকাশ রাখিতেই চেষ্টা পায়, মনোহরকে সম্ভব হইলে মুখের কথায় ও ব্যবহারে খুশী রাখিতেই চেষ্টা করে।

ঘাট হইতে মনোহর ফিরিয়া পূজামণ্ডপে যেখানে শশী কুমোর প্রতিমায় রং চাপাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সেখানে গিয়া বসিল। শশীর বয়স মনোহরের চেয়ে সামান্য বেশী হইলেও হইতে পারে। দুইজনে কথা বেশ জমিয়া উঠিল। মনোহর উৎসাহী শ্রোতা পাইয়া অনর্গল কবে কোথায় কি পালা কেমন গাহিয়াছিল, কাহার অসুখ হইয়া পড়ায় তাহাকে কি আসুরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, কোথায় কোন্

জমিদারের অন্দরমহল হইতে তাহার ডাক আসিয়াছিল—টাকাটা-সিকেটা বকশিশ মিলিয়াছিল, কবে কোথায় কে কি হাস্যকর কাণ্ড করিয়াছিল, কোথায় কেমন আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়া মিলিয়াছিল···ইত্যাদি অফুরন্ত কত কথা! শশীও নিজের কথা দুই-একবার বলিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু মনোহরের কাছে তাহা তেমন আমল পায় নাই। তেমন শুনাইবার মত কোন ঘটনাও শশীর জীবনে ঘটে নাই। কাজেই সে থামিয়াছিল। মনোহর অনেক দেখিয়াছে, অনেক কিছু বলিবার অধিকারও তাহার আছে, কাজেই সে প্রায় এক-তরফাই বলিয়া চলিয়াছিল। শশী তাহাকে কোথাও বাধা দিতেছিল না। একান্ত মুগ্ধ শ্রোতার মত সে শুধু শুনিয়া যাইতেছিল এবং প্রয়োজন হইলে একটু মাথাটা দোলাইয়া, চক্ষু নাচাইয়া বা হাসিয়া মনোহরের বলার উৎসাহ জোগাইয়া চলিয়াছিল। মনোহরকে পাইয়া শশী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি বাল্যকাল হইতেই শশীর যাত্রা শোনার ভারি ঝোঁক ছিল এবং বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ঝোঁক তাহার বাড়িয়াই চলিতেছে। আশেপাশে পনেরো-ষোল মাইলের মধ্যে যে-কোন গ্রামেই যাত্রা হউক না কেন, শশী সেখানে সংবাদ পাইলে উপস্থিত থাকেই। যাত্রা শোনার তাহার এমনই নেশা। যাত্রার দলের লোকেদের প্রতি তাহার একান্ত শ্রদ্ধা। তাহাদের সে অসাধারণ মানুষ বলিয়াই জ্ঞান করে। জীবনে তাহার যাত্রার দলের ছেলেদের কাহারও সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আজ সে-সৌভাগ্য হওয়ায় সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশীর একটা দিনের কথা আজিও মনে পড়ে। সে দিনটি জীবনে তাহার স্মরণীয় দিন। নূপুরগঞ্জের হাটে শ্যামানন্দপুরের প্রহ্লাদ সামন্তের দল যাত্রা গাহিতে আসিয়াছিল। প্রহ্লাদ সামন্তের মস্ত দল—লোক-লস্কর ছেলে-ছোকরা তাহার দলে বহু। শশীর বয়স তখন ষোল-সতেরো হইবে। শশীর কেমন জানি যাত্রার দলের সাজঘরের প্রতি

একটা দুর্ব্বলতা ছিল। সেখানে সে দুই-একবার উঁকি-ঝুঁকি না মারিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। সেদিনও সে সাজঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পালা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। প্রহ্লাদ সামন্তের দলের যে লোকটি ভীম সাজিয়াছে সে খুব নাম-করা 'য়্যাক্টর'—গলার জোরে আসর কাঁপাইয়া ছাড়িতেছে। হঠাৎ আসর হইতে বেগে সে সাজঘরের দিকে আসিতে গিয়া প্রায় শশীর গায়ের উপর আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নিজেকে খুব সামলাইয়া লইয়া শশীর একটা হাত ধরিল। ধরিয়াই বলিল, একটা কাজ করতে পারো হে ছোক্‌রা? ঐ যে পান-বিড়ির দোকান—ওখান থেকে এক পয়সার বিড়ি এনে দিতে পারো?

শশী পয়সা চাহিয়া লইতে ভুলিয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া এক পয়সার বিড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল। ভীম উচ্চবংশের সন্তান—কাজেই সামান্য একটা পয়সার কথা কানেই তুলিল না। সে কারণে শশীর কোন ক্ষোভ নাই। পয়সা সেদিন তাহার সার্থক হইয়াছে সে মনে করে। ভীম তাহার নিকট বিড়ি চাহিয়া খাইয়াছে—এ কি কম গৌরব তাহার! শশীর মুখে তাহার এই কৃতিত্ব বা গৌরবময় কাহিনী এযাবৎ বহুলোকেই শুনিয়াছে এবং বহুবার শুনিয়াছে। কাজেই শশীর কাছে মনোহর যে অপার্থিব বস্তুর সামিল হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। শশী মুগ্ধ বিস্ময়ে মনোহরের সকল কথা শুনিয়া চলিয়াছিল। শেষে মনোহর উঠিতে চায় ত শশী আর ছাড়ে না। মনোহরের মহা বিপদ দেখা দিল।

টিয়া কিন্তু ঘাট হইতে ফিরিয়াই মনোহরকে এড়াইবার জন্য কাজের অছিলায় বাব্‌লির সঙ্গে তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেল। বাব্‌লিদের বাড়ী গিয়া বাব্‌লিকে সে সকল কথা খুলিয়াই বলিল। একান্ত না ফিরিলেই আর যখন নয় তখন সে বাড়ী ফিরিল—মুখে দুঃস্বপ্ন আর দুশ্চিন্তার গভীর ছায়া লইয়া।

মনোহর যেদিন আসিল তাহার ঠিক পরের দিনই নিশি সজ্জন দুইজন অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। তাহাদের আহারাদির জন্য একটু বিশেষ রকম ব্যবস্থা করিল। নিশি সজ্জনের মনের কথা মনেই ছিল। অতিথিদ্বয়—একজন প্রৌঢ় এবং আর একজন যুবক—আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখনই প্রথম লোকে জানিল যে তাহারা টিয়াকে দেখিতে আসিয়াছে। এমন কি রূপসীও এসম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই।

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাম চন্দ্রনাথ। টিয়াকে দেখিয়া সে নিশি সজ্জনকে বলিল, মা যেন আমার ঘরে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিল। বলেন ত বে'ই, এখনই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তারপরে টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যাবে ত মা আমার ঘরে?

টিয়ার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এ-ধরণের কথাবার্ত্তা জীবনে সে এই প্রথম শুনিতেছে।

চন্দ্রনাথ দু-তিন মিনিটে ক'নে দেখা পর্ব্ব শেষ করিয়া উঠিল। টিয়াকে কেন জানি একটা প্রশ্ন করাও সে প্রয়োজন বোধ করিল না। টিয়া মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা আমার সাক্ষাৎ প্রতিমে—এ আর দেখবো কি! ওঠ্ রে গোবিন্দ।

চন্দ্রনাথের সঙ্গের যুবকটির নাম গোবিন্দ। টিয়ার দিকে একটা তীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টি ফেলিয়া গোবিন্দ চন্দ্রনাথের সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইল। অতিথিদ্বয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে পর সকলে জানিল যে, শিখীপুচ্ছ হইতে মাইল সাতেক দূরে এবং বকফুলীর অপরপারের ডাহুকদীঘি গ্রাম হইতে তাহারা আসিয়াছিল। চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র মোহনের সঙ্গে টিযার সম্বন্ধ হইতেছে। চন্দ্রনাথ একজন ধনী ব্যবসায়ী—রেঙ্গুনে তাহার মশলার মস্ত কারবার আছে এবং পুরুষানুক্রমে তাহাদের সেই কারবার। একমাত্র অসুবিধার কথা এই যে, গ্রামে তাহাদের আসা-যাওয়া খুব কম।

তাহারা একপ্রকার রেঙ্গুনের মানুষই হইয়া গিয়াছে। তবে বিবাহাদি এখনও দেশেই হইতেছে, পরে হয় ত তাহাও হইবে না। কিন্তু মেয়ে এমন ঘরে পড়িলে সুখেই থাকিবে বলিয়া নিশি সজ্জনের ধারণা। এখানে বিবাহ হইলে অগ্রহায়ণের মধ্যেই বিবাহকার্য্য শেষ করিতে হইবে, কেন না চন্দ্রনাথের পক্ষে ইহার বেশী আর একদিনও দেশে থাকা চলিবে না এবং আবার কবে সুবিধা করিয়া যে দেশে আসিয়া পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে তাহাও কিছু ঠিক নাই। নিশি সজ্জনের ইচ্ছা, অগ্রহায়ণের মধ্যেই টিয়ার বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়।

চন্দ্রনাথ টিয়াকে পছন্দ করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাওয়ার পরই টিয়া সহসা অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিল। মন তাহার শঙ্কা ও দুর্ভাবনায় নিপীড়িত হইতে লাগিল। একান্তে তাই সে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল—সুন্দরের কথা। এতক্ষণ কিন্তু সুন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন চেতনা ছিল না? কি যে তাহার হইতে যাইতেছে তাহা সঠিক ধারণায় সে আনিতে পারিতেছিল না। শুধু তাহার মনে হইল, বনপলাশীর দত্ত-বাড়ীর সুন্দর যদি বংশানুক্রমে তাহাদের শত্রু না হইত তাহা হইলে তাহাকে হয় ত এমন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। তাহা হইলে জীবনে হয় ত কোন জটিলতাই দেখা দিত না। টিয়ার মন বড় খারাপ হইয়া গেল। কেমন একটা অলস আত্ম-বিস্মৃতি সর্ব্ব দেহ-মনের উপর চাপিয়া বসিল। শেষ পর্য্যন্ত অকারণে তাহার চোখে জল দেখা দিল। চোখে জল দেখা দিতেই মনে পড়িল, মায়ের কথা। নিজের মনের কথা বলিবার মত যে একজন ছিল সেও আজ নাই। একটা সামান্য আব্দার জানাইবার মত লোকের তাহার আজ অভাব ঘটিয়াছে। অভিযোগ জানাইবার মত একজনও লোক দুনিয়ায় তাহার নাই। আজ নিজেকে তাই টিয়া নিতান্ত নিঃস্ব বলিয়া বোধ করিল।

মনোহর কিন্তু টিয়াকে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জনের বিশেষ সুযোগ দিল না। খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল। মনোহর কাছে আসিতেই টিয়া নিজেকে কোনরকমে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোহর টিয়ার এই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ভুল বুঝিয়াছিল। টিয়া যে লজ্জায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাই মনোহরের মনে হইয়াছিল। কাজেই মনোহর বলিল, তোমার বুঝি লজ্জা করচে টিয়া ?

এমন কথার কি যে উত্তর দেওয়া চলিতে পারে তাহা টিয়া ভাবিয়া পাইল না এবং মনোহরের কথার পর সত্যই কেমন জানি তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। সে নীরবেই তাই দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

মনোহর ক্ষণিক নীরব থাকিয়া আবার বলিল, আর কখনও শিখীপুচ্ছে আমি আসবো না টিয়া। আর আসবোই বা কার জন্যে। শিখীপুচ্ছে আসতে আর আমার ভালও লাগবে না।

টিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, কেন আসবে না শুনি মনোহর মামা ? তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসবে ত মাঝে মাঝে ?

মনোহর মৃদু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, না, আর কখনও আসবো না। আজকেই চ'লে যাবো ভাবচি।

টিয়া কি যে বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। মনোহরের জন্য কেন জানি তাহার আজ সহানুভূতি জাগিল। কিন্তু মনোহরকে দুই দিন থাকিবার জন্যও অনুরোধ করিতেও সে পারিল না।

বৈকালের দিকে মনোহর চলিয়া গেল। কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়াই সে চলিয়া গেল। আজ এই প্রথম টিয়া মনোহরের বিদায় গ্রহণে কেমন যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। এতদিন যে মনোহরকে অত্যন্ত বিরক্তি-কর বলিয়া টিয়ার মনে হইয়াছে সেই মনোহরও আজ তাহার মনে ব্যথার

দাগ বুলাইয়া সহানুভূতি জাগাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। টিয়ার মনে এতদিন যে বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধভাব মনোহরের প্রতি বর্ত্তমান ছিল তাহা মনোহর বিদায়ের গুরুভার নিশ্বাস দিয়া চিরদিনের মত চাপা দিয়া চলিয়া গেল। টিয়া কেমন যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল মনোহরের বিদায় গ্রহণে।

ভৈরব দত্ত পূজার বাজার সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সে এক নূতন সংবাদ আনিয়াছে। সংবাদটি এই—মধুমালতীর অন্নদা ঘোষ ভৈরব দত্তের কাছে হাঁটাহাঁটি সুরু করিয়াছে এবং অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে তাহার কন্যা ইন্দুমতীর সহিত সুন্দরের বিবাহ দিবার জন্য। কন্যা তাহার পরমা সুন্দরী—নিতান্ত শত্রু যে সেও নাকি তাহা স্বীকার করিবে। অর্থবল তাহার তেমন নাই, তবে সাধারণভাবে সে সমস্তই দিতে প্রস্তুত আছে এবং সাধ্যমত ত্রুটি করিবে না। এখন ভৈরব দত্ত কন্যা দেখিয়া মত দিলেই নাকি সব কিছু পাকাপাকিরূপে ঠিক হইয়া যায়। ভৈরব দত্ত তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, এবার পূজা শেষ করিয়া আসিয়াই সে কন্যা দেখিতে যাইবে এবং কন্যা যদি পরমা সুন্দরী হয় তাহা হইলে অন্য কিছুর জন্য আর আটকাইবে না।

কথাটা সুন্দরের কানেও গেল। সুন্দর শুনিয়া প্রথম ভ্রূকুটি করিল, পরে নিজের মনে মনেই বলিয়া উঠিল, হুঁ, অন্নদা ঘোষের মেয়ে বিয়ে করবো না আরও কিছু! বাবার যেমন—এসে ধরেচেন, আর গলে গেচেন!

শ্রীমন্তও আসিয়া ঠিক এই একই কথাই তুলিল। সুন্দর কি যে বলা উচিত হইবে ভাবিয়া না পাইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়াই বলিল, চুপ্ কর তো শ্রীমন্ত। আর ওকথার আমি উত্তর দিতে পারি না। বিয়ে এখন আমি করবো না, কিছুতেই করবো না। রোজগার করি না এক পয়সা, তার বিয়ে করবো আবার কি শুনি?

শ্রীমন্ত উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, যাক্, একটা ছল-ছুতো তবু যা-হোক

বের করেচিস্, কিন্তু এ যে টিকবে না। তোর আবার রোজগার করবার দরকারটা কি শুনি? ওদিকে অঘ্রাণে যে শক্রর বাড়ীতে সানাই বাজবে শুনতে পাই। যাতে এক তারিখেই দু'টো লাগে তার চেষ্টা দেখ্ না।

সুন্দর ক্ষণিকের জন্য মাত্র বিচলিত হইল এবং পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযম শাসনে বাঁধিয়া উত্তর দিল, সে ত ভালই। এ-বাড়ীতে সানাই আর না বাজতে হ'লো।

শ্রীমন্ত মুখ টিপিয়া এবার হাসিল।

শ্রীমন্তর কি যেন বিশেষ কাজ ছিল, সে তাই বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কি প্রকারে নিজের বিবাহে কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া যে বাধা জন্মানো সম্ভব হইতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। শ্রীমন্ত যে টিয়ার বিবাহের কথা বলিয়া গেল তাহার সত্য-মিথ্যাই বা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? সুন্দর মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। বাড়ীতে পূজার হৈ চৈ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সুন্দর ক্রমেই যেন তাহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে-ছিল। প্রয়োজনের সময় পর্য্যন্ত তাহাকে কেহ ডাকিয়া পাইতেছিল না। সুন্দর নৌকা লইয়া সময়ে-অসময়ে হাজারখুনীর বিলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল নিতান্ত উদাসীর মত। এ কয়দিন সে নৌকা লইয়া ঘাট হইতে খালে পড়িয়া হাজারখুনীর বিলে গেছে, কিন্তু একবারও সে ভুল করিয়া পর্য্যন্ত সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহে নাই। টিয়া তাহার নিজের বিবাহ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানিয়াও এবং শ্রীমন্তের কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই না করা সত্বেও অভিমান জাগিল তাহার টিয়ার 'পরে। টিয়ার উপর অভিমান করিবার অধিকার যেন তাহার আছে বলিয়া সে মনে করিল। কিন্তু টিয়া এসব ব্যাপারে যে তার চাইতেও শক্তিহীন তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখিল না। বিবাহে বাধা জন্মাইলে একমাত্র সে-ই

হয় ত নিজের বিবাহে বাধা দিতে পারে, কিন্তু টিয়া কিছুতেই পারে না। আশ্চর্য্য, সুন্দর কিন্তু ভাবিতে লাগিল, যদি কেহ পারে ত সে যেন টিয়া। সেই টিয়াই যখন বাধা জন্মাইতে চেষ্টা পাইতেছে না—অগ্রহায়ণেই যখন তার বিবাহ তখন সুন্দর নিঃসন্দেহ হইতে চেষ্টা করিল যে, টিয়া তাহাকে কোন দিন ভালবাসে নাই—বাসিতেও পারে না—এতকালের শত্রুতা ভুলিয়া ভালবাসা সম্ভবও নয়। আবার সে ভাবে, শত্রুর সঙ্গে পরম শত্রুতা সাধনই তাহার উচিত হইবে। একদিন জোর করিয়া টিয়াকে সবলে শত্রুদুর্গ হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিরুদ্দেশ হইলেই যেন উপযুক্ত শত্রুতা সাধন হয় বলিয়াই মনে হয়। এমনই আরও কত ঘোর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহার দিবারাত্র কাটিতেছে। মন তাহার বিষণ্ণ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রাত্রিতে হাজারখুনীর বিলে নৌকার 'পরে বসিয়া সে তাহার জীবনে যে দুর্য্যোগময়ী নিশির সূচনা দেখিতে পাইয়াছে তাহারই পূর্ণরূপ পরিকল্পনায় মত্ত হইয়া উঠে—বাঁশীটি বাজাইয়া নিশীথের নিথর নিস্পন্দ অন্তরাত্মায় চেতনা সঞ্চারের বাসনা মনে আর জাগে না—বাঁশীটি অনাদর অবহেলায় নৌকার পাটাতনের 'পরেই লুটাইতে থাকে। সুন্দর বাঁশীটির প্রয়োজন আর অনুভব করে না—সঙ্গে লইয়া যায় মাত্র। পরম নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে বাঁশীর প্রয়োজন অনুভব করিলেও করিতেও পারে হয় ত, কিন্তু গভীর নির্জ্জনেও এখন নিজেকে সে আর নিঃসঙ্গ ভাবিতে পারে না। টিয়ার তুচ্ছ কথার কণিকা, হাসির টুক্‌রা, চলার ভঙ্গিমা যেন প্রাণবন্ত সজীব চিত্রাবলীর মত জাগিয়া থাকে তাহার চোখের সম্মুখে এবং বিষ ঢালিয়া দেয় তাহার কর্ণকুহরে। নিরন্তর এ জ্বালা লইয়া মানুষ নিজেকে কিছুতেই নিঃসঙ্গ ভাবিতে পারে না।

কিছুদিন যাবৎ তাই গভীর রাত্রে আর চমকিয়া উঠিয়া কলঙ্কিনীর খাল সুন্দরের মোহন বাঁশী শুনিবার জন্ম কান পাতে নাই, হাজারখুনীর বিলেও শিহরণ জাগে নাই। সুন্দরের বাঁশী না জানি সুর হারাইয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীমন্ত সুন্দরের বাঁশী শুনিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াই বিফল-মনোরথ হইয়াছে।

রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই। অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছে। সুন্দর আধ-ঘুম আধ-জাগরণে দূর হইতে ভাসিয়া আসা সানাইয়ের সুর শুনিতে পাইল। ওপারের সজ্জন-বাড়ীতেই সানাই বাজিতেছিল। সুন্দরের সর্ব্ব দেহ-মনে তখনও ঘুমের নিবিড় আবেশ জড়াইয়া ছিল। সানাইয়ের মধুর সুর কিছুমাত্র মাধুর্য্য তাহার বিক্ষুব্ধ বিচলিত হৃদয়-মনে ঢালিয়া দিতে পারিল না। বরং জাগাইয়া তুলিল একপ্রকার অনীপ্সিত অস্বস্তি। সুন্দর কেমন একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব জ্বালায় শয্যা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহিল। সানাইয়ের একটানা সুর বাজিয়া চলিতে লাগিল। এ যেন টিয়ার বিবাহের জন্ম ভোররাত্রে সানাই বাজিতে সুরু করিয়াছে এবং সুন্দরের মনকে পীড়িত মূর্চ্ছিত করিয়া বাজিবার আগ্রহেই শুধু বাজিতেছে। যেন আর বিরাম বিরতি বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু সুন্দর একবার ভাবিতে চেষ্টা পাইল না যে, প্রতি বৎসর এমনই সপ্তমীর ভোর রাত্রে সানাই বাজিয়া পূজার সূচনা হয়। অল্প পরেই সানাইয়ের মধুর রাগিণী কাড়া-নাকাড়া সহযোগে বাজিতে লাগিল। ওপারের বাজনা চাপা পড়িয়া গেল সুন্দরের নিজেদের বাড়ীর বাজনার কাছে। সুন্দর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। এতক্ষণে মন তাহার যেন স্বস্তি মানিল। কিন্তু যে ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাও মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল না।

টিয়ার বিবাহের সানাই বাজিয়া ওঠার বিলম্বও আর বড় নাই। তাহার এমন সাধ্য নাই যে সে কোনপ্রকারে তাহাতে বাধা দিতে পারে। ভালবাসিলেই আর অধিকার কিছু জন্মায় না, টিয়ার উপর তাহার কোন অধিকারই তাই নাই। কবেকার কোন্ পূর্ব্বপুরুষের

শত্রুতা আজিও শত্রুতা করিতে কসুর করিতেছে না। সার্থক সে শত্রুতা!

সুন্দর উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসার পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত আসিয়া ডাক দিল।

সুন্দর দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শ্রীমন্ত দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল। সুন্দরকে চোখ রগ্‌ড়াইতে দেখিয়া শ্রীমন্ত বলিল, বাঃ রে, চোখ থেকে এখনও ঘুম ছাড়ে নি? এতক্ষণ কি বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে সানাই শুনছিলি হতভাগা? সজ্জন-বাড়ী চমৎকার সানাই বাজছিল কিন্তু।

সুন্দর শ্রীমন্তর কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল এবং লজ্জা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা করিয়াই বলিল, সানাই আবার বাজছিল কখন, কোথায় রে?

শ্রীমন্ত বলিল, কেন, সজ্জন-বাড়ী। তোদের বাড়ীতেও ত বাজছিল।

সুন্দরের দরজা খুলিয়া বাহির হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই ঠিক উভয় বাড়ীর বাজনাই বন্ধ হইয়াছিল। কাজেই সুন্দর সুবিধা পাইয়া বলিল, তা হবে। ঘুমিয়ে ছিলাম, শুনতে পাইনি তাই হয়ত।

কথাটা শ্রীমন্তর বিশ্বাস হইল না। কেন না, শ্রীমন্ত নিজেদের বাড়ী হইতেই পূজা-বাড়ীর বাজনা শুনিয়া আসিয়াছিল। আর সুন্দর এত কাছে থাকিয়া যে শোনে নাই তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ্বাস করা যায়ও না।

শ্রীমন্ত বলিল, হয়েচে! ন্যাকামি আমরাও অনেক জানি রে সুন্দর; কিন্তু এমন জল-জ্যান্ত মিথ্যে কথা তা ব'লে বলতে পারি না। সজ্জন-বাড়ীর সানাই শুনে তোর ঘুম ভাঙেনি মিথ্যুক?

সুন্দর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ভেঙ্গেচে ত। তা, তুই অত চটচিস্ কেন?

শ্রীমন্ত বলিল, চটচি তুই সত্যি কথা এতক্ষণ বলছিলি না দেখে। যাক্, রাত থাকতে উঠে এই বুঝি তুই আমাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নূপুরগঞ্জে গেলি? সেখানে না তোর কাজ ছিল অনেক!

সুন্দর বলিল, রাত্ থাকতে আর উঠতে পারিনি, তা আর তোকে ডাকব কি! কিন্তু যেতেই হবে নূপুরগঞ্জে—কাজ রয়েচে সেখানে অনেক। তুই বোস্, আমি চট্ ক'রে মুখ-চোখ ধুয়ে আসি ঘাট থেকে।

শ্রীমন্ত বসিয়াই রহিল। কিন্তু সুন্দর আর ঘাট হইতে ফিরিয়া আসে না। অনেকক্ষণ সুন্দরের অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শ্রীমন্তর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। না জানি ওপারে টিয়াকে সুন্দর দেখিতে পাইয়া ঘাটেই সব কাজ ভুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কখন ফিরিবে কে জানে। শ্রীমন্ত উঠিয়া শেষে ঘাটের দিকেই গেল সুন্দরের সন্ধানে। কিন্তু সুন্দর ঘাটে নাই। ওপারের সজ্জন-বাড়ীর ঘাটে মেয়েরা পূজার কি সব জিনিষপত্র যেন ধুইতে আসিয়া জটলা করিতেছে, টিয়াও তাহাদের মধ্যে আছে। শ্রীমন্ত এদিক-সেদিক তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু সুন্দরের দেখা মিলিল না। শ্রীমন্ত বেশ ভাবনায় পড়িয়া গেল। তাই ত, সুন্দর আবার গেলই বা কোথায়? শ্রীমন্ত শেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ী চলিয়া যাইতেই মনস্থ করিল এবং ফিরিয়াই দেখিল, সুন্দর তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমন্ত বলিল, এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

সুন্দর সলাজ হাসিয়া উত্তরে বলিল, কেন, বাড়ীর ভেতর। তিনবার ঘাটে এসে ফিরে গেচি, ওঘাট থেকে ওরা ওঠে না তার আমি কি করব! এতক্ষণ ঘাটে আসতে পারিনি, কাজেই বাসী মুখেই আছি। তোর কাছে ফিরে যেতেও ভরসা হ'ল না, কি জানি হয় ত ঠাট্টা জুড়ে দিবি।

শ্রীমন্ত প্রাণ খুলিয়া হাসিল। না হাসিয়া যেন তাহার নিস্তার ছিলনা। সুন্দরের আজিকার এই লজ্জা যতই কেন না অদ্ভুত বলিয়া বোধ হউক—অসঙ্গত নয়। শ্রীমন্ত তাহা বুঝিল, কিন্তু না হাসিলে পাছে সুন্দর আরও বেশী বিব্রত হইয়া পড়ে সেজন্যই যেন তাহার হাসার প্রয়োজন দেখা দিল। সুন্দরও হাসিল। বলিল, কি জানি—সত্যি কথাই তোকে বললাম।

শ্রীমন্ত বলিল, সে আমি জানি, মিথ্যে ব'লে লাভ নেই জেনেই হয় ত

এত সহজে সত্যি কথা বললি। কিন্তু আরও আগে বললেই যেন ভাল হ'ত। নূপুরগঞ্জে যাবি আর কখন শুনি ?

সুন্দর বলিল, এ-বেলা আর যাওয়া হবে না দেখতে পাচ্ছি, ওবেলাই বরং যাওয়া যাবে'খন।

শ্রীমন্ত বলিল, তা বেশ, তবে আমি চলি। ও-বেলা পথ থেকে ডেকে নিয়ে যাস্।

সুন্দর তাহাতেই রাজি হইয়া শ্রীমন্তকে বিদায় দিয়া দিল। কিন্তু ঘাটে নামিতে তাহার সর্ব্বশরীরে আজ কেন জানি রোমাঞ্চ জাগিল। ওপারের সব কয়জোড়া চক্ষুই যেন তাহাকে একাগ্রভাবে দেখিতেছে। এমন বিশ্রী অবস্থায় জীবনে সুন্দর আর কখনও পড়িয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। নিজের অপ্রতিভ দৃষ্টি তুলিয়া ওপারের পানে চাহিতে সে লজ্জায় মরিয়া গেল। না পারিল অপাঙ্গে চোরা-দৃষ্টিতে চাহিতে পর্য্যন্ত। ভয় হইল, পাছে পা আবার মাটিতে জড়াইয়া, কি ঘাটের পৈঠায় বাধিয়া সে পড়িয়া যায়। সে স্পষ্টই অনুভব করিল, সে যেন আজ পরাজিত শত্রু, বিক্রম তাহার ধূলায় চিরদিনের মত লুটাইয়া গেছে, মুখ তুলিয়া লোকসমক্ষে দাঁড়াইবার পথ যেন আর তাহার নাই। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাহার মনে পড়িল, কি কুক্ষণেই না জানি খেলাচ্ছলে এই ঘাটে দাঁড়াইয়া একদিন ছাতির শিকের মাথায় ফুঁড়িয়া পিটুলি ফল ওপারের ঘাটে দণ্ডায়মানা টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া সে ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়াছিল। এতদিনে তাহার অনুতাপ দেখা দিল। সেদিনের এই সামান্য ভুলটা না করিলেই যেন জীবনে তাহার আজিকার এই অর্থহীন শূন্যতার দৈন্য এমন করিয়া হাহাকার করিয়া ফিরিত না।

ওপারের ঘাটে হঠাৎ হাসাহাসি পড়িয়া গেল। সুন্দর চম্‌কাইয়া সেদিকপানে চাহিল। টিয়া কিন্তু নীরব। তাহার মুখে হাসির কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। বরং সেখানে যেন বিরাজ করিতেছে আষাঢ়ের

গাঢ়তম মেঘমায়া। টিয়া যেন বড় শুকাইয়া গেছে—সুন্দরের সহসা মনে হইল। সুন্দর চোখে-মুখে কোনরকমে জল ছিটাইয়া ঘাট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মন তাহার সহসা আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল। টিয়ার অন্তরতম গোপন কথাটি সে যেন তাহারই মুখে আজ প্রতিভাসিত দেখিতে পাইয়াছে। টিয়া নিজের বিবাহ-ব্যাপারে তাহা হইলে খুশী হয় নাই—দুশ্চিন্তা তাহাকেও তবে পাইয়া বসিয়াছে। এমন অনেক কথাই সুন্দরের মনে হইল। সুখ-কল্পনা হইতে মানুষ নিজেকে কিছুতেই কেন জানি বিরত রাখিতে পারে না। সুন্দরও পারিল না। কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাই না সে মনে মনে করিল। টিয়াকে পাওয়া তাহার পক্ষে খুব অসম্ভব বলিযাও বোধ হইল না। কিন্তু পাওয়ার পথটা সে অবশ্য দৈবের উপর ছাড়িয়া দিতেই বাধ্য হইল। কেন না, শত্রুদুর্গে প্রবেশের পথ শত্রুতার দ্বারাই একমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব—মিত্রতার দ্বারা নয়।

আবার কাড়া-নাকাড়া বাজিতে সুরু করিয়া দিল। সানাই এখন বিশ্রাম লইতেছে। সুন্দরের সুখ ও দুঃখ বিজড়িত কল্পনা-সূত্র সহসা কাটিয়া গেল। সুন্দর ত্রস্তে পূজামণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল। কাজের তাহার আজ অন্ত নাই, কিন্তু কাজে আর তাহার কিছুতেই মন মানিতেছে না।

দশমীর ভোরে সুন্দরের ঘুম ভাঙিল অদ্ভুত সংকল্পে। আজ সেই বহুশ্রুত প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন—কলঙ্কিনীর খাল নাকি এই দিনে দুই বাড়ীর শত্রুতার সংঘর্ষে বহু হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছে, রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুন্দরের জীবনে কখনও তাহা সংঘটিত হয় নাই। আজ সহসা কেন জানি সুন্দরের মনে বহুকালের স্তিমিত শত্রুতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আবার সেই শত্রু-সংঘর্ষের মহামুহূর্ত্তটি তাহার মনে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বৈকালে প্রতিমা বিসর্জ্জনের

সময় আবার নূতন করিয়া দুই বাড়ীর শত্রুতা সুরু করিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি সুন্দর করিবে না এবং সেজন্য প্রস্তুত হইতেও সে লাগিল। নিশি সজ্জন প্রতি বৎসর বহু আড়ম্বরে ও আস্ফালনের সঙ্গে যে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে প্রতিমা ডুবাইতেছে ভৈরব দত্তের শান্তিপ্রিয় মনের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া—তাহা এ-বৎসর সুন্দর কিছুতেই আর সম্ভব হইতে দিবে না। এ-বৎসর দত্ত-বাড়ীর প্রতিমা সুন্দর জোর করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ডুবাইবে। তাহাতে যদি নিশি সজ্জন কোনপ্রকার বাধা জন্মাইতে চেষ্টা পায় ত সুন্দর দেখিয়া লইবে আজ, তাহাদের দুই বাড়ীর শত্রুতার শেষ কোথাও আছে কিনা। শত্রুতা করিতে হইলে চরমভাবে শত্রুতা করাই ভাল। সুন্দর আজ আর মনে কোনপ্রকার ক্ষোভ রাখিবে না। বিসর্জ্জনের বাজনা আজ রণ-দামামায় তবে পরিণত হউক। পূর্ব্বপুরুষের ক্ষুব্ধ আত্মায় আজ খুশী বনাইয়া উঠুক্। সুন্দর অভিনব সংকল্পে আজ মাতিয়া উঠিল।

ভোরেই উঠিয়া তাই সে একা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া গেল বকফুলী নদীতে। বকফুলীর ওপারে নূপুরগঞ্জের পাশের নদীসংলগ্ন গ্রাম হুতাশীতে তাহাদের কয়েক ঘর প্রজার বসতি আছে। এককালে নাকি এই হুতাশী হইতেই প্রজারা বিসর্জ্জনের দিন সড়্কি বল্লম লইয়া দলে দলে আসিত মনিবের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে। মধ্যাহ্নেই কলঙ্কিনীর খালে কাতারে কাতারে নৌকা দাঁড়াইয়া যাইত—দুই পাড়ে জন-সমাগম হইত—কলঙ্কিনীর খাল মাতিয়া উঠিত। সুন্দর সেই হুতাশীর প্রজাদের বাড়ী বহিয়া নিজেই সংবাদ দিয়া আসিল, আজ বিসর্জ্জনের সময় গোলমাল বাঁধিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, কাজেই সকলে যেন প্রস্তুত হইয়াই আসে। হুতাশীর কয় ঘর প্রজা মনিব-পুত্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া জানাইয়া দিল যে, যথাসময়ে তাহারা হাজির হইবে এবং মনিবের সম্মান অটুট রাখিতে প্রাণ দিতেও তাহারা কিছুমাত্র কার্পণ্য করিবে না।

সুন্দর হুতাশীতে খবর দিয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেশ বেলা হইয়া গেছে—মুখে তাহার না জানি আবার এই দুঃসংকল্পের ছায়া পড়িয়াছে। সে একটু বিশেষ বিব্রত বিচলিত অবস্থায় তাই বাড়ী ফিরিল এবং সকলকে এড়াইয়া চলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিসর্জ্জনের কালে বহু প্রজার সশস্ত্র আগমনে ভৈরব দত্ত কেমন যেন একটু বিচলিত হইল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—অতীতের কথা—বিস্মৃতপ্রায় বহু কাহিনী। কিন্তু প্রজাদের এই সশস্ত্র আগমন সম্বন্ধে সে পূর্ব্বাহ্ণে কিছুই জানিতে পারে নাই এবং কি প্রয়োজনে যে তাহারা আসিয়াছে তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। হুতাশীর শ্রীদাম ও সুদাম দুই ভাই আসিয়া যখন ভৈরব দত্তের পদধূলি গ্রহণ করিল তখন সে বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল, তোরা কি করতে এলি এখানে? আবার যে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই একেবারে?

—কি রকম! দাদাবাবু যে নিজেই গিয়ে আমাদের খবর দিয়ে নিয়ে এল। বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, আসতে হবে। তাই ত দু'ভায়ে চ'লে এলাম।—বলিয়া শ্রীদাম চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সুন্দরকেই সন্ধান করিতে লাগিল।

ভৈরব দত্ত অধিকতর বিস্ময়ে বলিল, তাই নাকি? কিন্তু সুন্দর ত কই আমাকে তার কিছুই বলেনি।

তারপরে ডাক ছাড়িয়া সুন্দরকে ডাকিতে লাগিল। সুন্দর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া এবং শ্রীদাম ও সুদামের পানে চাহিয়া পিতার প্রশ্নের পূর্ব্বেই সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল।

ভৈরব দত্ত বলিল, সুন্দর, এদের সব খবর করেচিস্ কেন?

সুন্দর উত্তরে বলিল, আজ গোলমাল একটা বাধবেই। চতুর্দ্দিকে নিশি সজ্জন ত সেই কথাই গেয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন নূপুরগঞ্জের হাটে দাঁড়িয়ে মধু ঘোষালকে সে এই কথাই শুনিয়েচে। কাজেই খবর করলাম।

ভৈরব দত্ত সস্মিত আননে বলিল, দূর পাগল! গোলমাল আমি কিছুতেই বাধতে দেব না। প্রতিমা কলঙ্কিনীর খালে বিসর্জ্জন দেওয়া নিয়ে ত গোলমাল বাধবে—তা আমি কিছুতেই বাধতে দেব না। দরকার হ'লে প্রতিমা বকফুলীতে নিয়েই বিসর্জ্জন দেব।

সুন্দর দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, না, এভাবে গাঁয়ের পথে-ঘাটে শত্রুর আস্ফালন অসহ্য! বকফুলীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলে গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে পারব না। সবাই একবাক্যে বলবে—ভীরু কাপুরুষ। আর আমাদেরই বংশে একদিন—

ভৈরব দত্ত বাধা দিয়া বলিল, বলে বলুক, তবু যা বহু চেষ্টায় একদিন থেমেচে, তা আর কিছুতেই আমি সুরু হ'তে দেব না। এই অকারণ শত্রুতার ফলে দু' বাড়ীর বহু রক্তই কলঙ্কিনীর জলে মিশেচে এপর্য্যন্ত। আর একবিন্দুও আমি সেখানে মিশতে দেব না। তাতে মান-সম্মান সব যদি আমাকে বিসর্জ্জন দিতেই হয় ত আমি প্রস্তুত আছি।

সুন্দর মাথা নীচু রাখিয়াই বলিল, আমরা হ'তে দেব না বললেই ত আর হয় না। ওরা যদি সুরু করে—তখন?

ভৈরব দত্ত বলিল, সে আমি বুঝব। না না শ্রীদাম, কোন গোলমালের আশঙ্কা আমি করি না। তোমরা দু'ভায়ে এসেচ দেখে আমি ভারি খুশী হয়েচি। বিসর্জ্জনের পর শান্তিজল মাথায় নিয়ে মিষ্টিমুখ ক'রে তবে বাড়ী যেয়ো।

সুন্দর অদূরে শ্রীমন্তকে আসিতে দেখিয়া মুক্তি পাইয়া বাঁচিল এবং শ্রীমন্তকে ডাকিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে সুরু করিল। স্ত্রীলোকেরা জোকার দিয়া দশভুজা মায়ের বরণের কাজ সিঁদুর পরাইয়া পান খাওয়াইয়া সারিয়া গেল। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা কলাপাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া একশো আটবার—'শ্রীশ্রীদুর্গা' লিখিয়া মায়ের চরণে ছোঁয়াইয়া দিয়া গেল। ঘটা

করিয়া মায়ের বিসর্জ্জনের অনুষ্ঠানগুলি একে একে শেষ হইতে লাগিল। সুন্দর ক্রমেই কেন জানি গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে বিষাদের গভীর ছায়া পড়িয়াছে, কাজেই সুন্দরের মুখের বিকার কেহ লক্ষ্য করিল না, আর করিলেও ধরিতে পারিত না। মুখে তাহার বিষাদের ছায়া গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া ছিল। সুন্দরও আর সকলের মত কলাপাতায় দুর্গানাম একশো আটবার লিখিল এবং লিখিতে গিয়াই সে প্রথম বুঝিল যে, কতদূর অন্যমনস্কই সে আজ হইয়া পড়িয়াছে। একবার ভুলক্রমে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' স্থানে সে টিয়ার নামটাই লিখিয়া ফেলিল। হয় ত টিয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতেই সে এতবড় ভুল করিয়াছে। কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া বাকীগুলি অতি যত্নসহকারে লিখিয়া শেষ করিল। এই ভুলের জন্য মন তাহার সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। কাজেই প্রতিমায় যখন সকলে আসিয়া কাঁধ দিল তখন সুন্দরও প্রতিমার একদিকে কাঁধ ঠেকাইল, কিন্তু কিছুমাত্র উদ্যম তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইল না। স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে জোকার দিয়া উঠিল। পুরুষেরা কাঁধে করিয়া প্রতিমা পূজামণ্ডপ হইতে বাহিরে নামাইল।

ভৈরব দত্ত সভয় ব্যগ্রতার সঙ্গে সকলকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিল। পাছে, প্রতিমা আবার কোন কিছুর সঙ্গে ঠেলিয়া কোন কিছু ভাঙ্গিয়া গৃহস্থের অমঙ্গল সূচনা করে। ভৈরব দত্ত অত্যন্ত কাতর নিবেদনে সকলকে যথারীতি সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিল। অবশ্য, ভৈরব দত্তের বলার কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়াই সকলে যথাসাধ্য সাবধান হইয়া উঠিয়াছিল। অতি গুরু কর্ত্তব্য সমুপস্থিত দেখিয়া সুন্দরও সমস্ত চিন্তা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইল। প্রতিমার চালির কম্পমান কল্‌কায় পর্য্যন্ত যাহাতে সামান্য চিড়্ না খায় সেদিকে সকলেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিমা কাঁধে লইয়া কলঙ্কিনীর খালের দিকে

অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘাটে আনিয়া যখন সকলে ধরাধরি করিয়া প্রতিমা নৌকায় তুলিল কোন অনর্থ না ঘটাইয়াই, তখন ভৈরব দত্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সানন্দ কৌতুকে বলিয়া উঠিল, মা'র অশেষ কৃপা, তাই বাধা পড়েনি কোন কাজেই! এখন নির্ব্বিঘ্নে বিসর্জ্জন হ'লেই আমার নিষ্কৃতি।

সুন্দর খালের জলে এক হাঁটু প্রায় নামিয়া দাঁড়াইয়া নৌকায় প্রতিমা তুলিয়াছিল। সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রতিমার একাংশ ধরিয়া ছিল। পিতার কথা শুনিয়া সে একবার ওপারের ঘাটের দিকে ফিরিয়া চাহিল। এপারের মত ওপারেও আয়োজনের বা লোকসমাগমের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। নিশি সজ্জনের বাড়ীর প্রতিমাও নৌকায় উঠিয়াছিল।

কিন্তু সমস্ত ছাড়াইয়া গিয়া সুন্দরের দৃষ্টি পড়িল ওপারের বাতাবি লেবু গাছটার তলায়—যেখানে আর সকল মেয়েদের মধ্যে টিয়াও দাঁড়াইয়া ছিল। টিয়ার মুখে কোন ভাব-বিপর্য্যয় দেখা গেল না। তবে সে যেন সুন্দরের পানেই দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইয়া আছে। ক্ষণিকের জন্য সুন্দরের মস্তিষ্কে রক্তের চাঞ্চল্য দেখা দিল। শত্রুতা সাধিতে হইলে আজ সেই বহুপ্রত্যাশিত শুভলগ্ন সমাগত কিন্তু টিয়া অমন করিয়া ওখানে দাঁড়াইয়া যদি সুন্দরের কীর্ত্তি-কলাপ নিরীক্ষণ করিতে থাকে ত সুন্দরের দ্বারা আর যাহাই কেন না সম্ভব হউক্, কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ একেবারে সম্ভব নয়।

শ্রীদাম ও সুদাম আর সকলের সঙ্গে প্রতিমায় কাঁধ দিয়াছিল, প্রতিমা সমেত তাহারা নৌকায় উঠিয়া প্রতিমা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অন্য আর একটি নৌকায় শ্রীদাম ও সুদামের সড়্‌কি-বল্লম মজুত ছিল। হুতাশীর আরও যে সব লোকজন আসিয়াছিল তাহারাও তাহাদের সড়্‌কি-বল্লম নৌকার পাটাতনের নীচে মজুত করিয়া রাখিয়াছিল—প্রয়োজনে কাজে লাগাইবার জন্য। কিন্তু ভৈরব দত্ত সকলকে যেভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছে ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে

তাহাতে ঈপ্সিত দাঙ্গার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াই কেহ মনে করিতে পারিল না।

চতুর্দ্দিকে কেমন একটা সামাল সামাল রব উঠিয়া গেল। কেহ বলিল, চালি সাম্‌লে! কেহ বলিল, কল্‌কাগুলো গেল বুঝি—সাম্‌লে, সাম্‌লে! কেহ বলিল, কার্ত্তিকের হাতখানা বাঁচিয়ে! ইত্যাদি কত কিছু। সে যেন মহাহট্টগোল সুরু হইয়া গেল। ভয়-ভাবনা আনন্দ-কোলাহল ব্যথা-বেদনা একই কালে সেখানে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল।

দুই বাড়ীর প্রতিমা প্রায় পাশাপাশিই ডুবানো হইতেছিল। কিন্তু যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লইয়া এতকাল এই দুই বাড়ীতে বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিরোধ-বিপত্তি ঘটিয়াছে সেই স্থানটিতে সগৌরবে নিশি সজ্জন তাহার বাড়ীর প্রতিমা বিনা বাধায় ডুবাইতে লাগিল। সুন্দর বাধা দিবে বলিয়া এবার ভাবিয়াছিল, কিন্তু কেন জানি তাহা কার্য্যকালে কিছুতেই সম্ভব হইল না। নিমজ্জমান প্রতিমা হইতে তাই সকলে যখন দেবীর চুড়া চালির কল্‌কা প্রভৃতি খসাইয়া লইয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কাড়াকাড়ি সুরু করিয়া দিল তখন সুন্দর কিন্তু নিস্পৃহ হইয়া একপাশে জলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের বিক্ষুব্ধ অন্তরের সহিত বোঝাপড়া করিতে লাগিল। ক্ষমতা তাহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ—এমন কি, টিয়ার উপস্থিতিতে সামান্য ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ক্ষমতাও যেন তাহার আর নাই। নিজের মনে মনেই সে তাই আজ চরম পরাজয় মানিয়া লইয়া নীরব হইয়া রহিল।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া সকলে খালের জলে স্নান করিয়া পাড়ে উঠিল। সুন্দরও সবার সঙ্গে স্নান সারিয়া পাড়ে উঠিল, কিন্তু সেখানে সে এক-মুহূর্ত্তও না দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। দেহ ও মনে চরম অবসাদ জড়াইয়া সে বাড়ী ফিরিল। শত্রুর হাতে এতদিনে যেন তাহার চরম অবমাননা হইয়াছে। শত্রুর সহিত

শক্রতা করার অধিকার হইতেও সে আজ বঞ্চিত—এমন নিষ্ঠুর পরাজয়ের আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয়-মন ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিসর্জ্জনান্তে পূজামণ্ডপে সকলেই ফিরিয়া আসিল। পূজামণ্ডপ শূন্য শ্রীহীন বলিয়া সবারই প্রাণে কেমন একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিল। সুন্দরও আসিয়া সভামধ্যে একদিকে আসন গ্রহণ করিল শান্তিজল গ্রহণের জন্য। পুরোহিত শান্তিজল আশীর্ব্বচনের সঙ্গে সবার মস্তকোপরি ছিটাইয়া দিল। তারপরে প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা কেমন একটা ব্যথা-কাতরতার মধ্য দিয়া শেষ হইল। সুন্দর এই সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করিয়া গেল মন্ত্রচালিতের মত। সুন্দর ব্যথা-কাতর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পূজা-বাড়ীতে বিজয়া দশমীর রাত্রে বিসর্জ্জনের পর সবারই অন্তরে যে ব্যথা-কাতরতা বিরাজ করে তাহা কিন্তু তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছিল না। কেমন একটা পরাজয়ের গ্লানি তাহার সর্ব্বদেহ ও মনের উপর নিবিড় বেদনার দাগ বুলাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। কাজেই শান্তিজল গ্রহণান্তে কোলাকুলির পালা শেষ করিয়া দলে দলে যখন গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে গেল বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গন সারিতে, তখন সুন্দর কিন্তু সকলের অলক্ষ্য সবার অনুরোধ এড়াইয়া কলঙ্কিনীর খালের নির্জ্জন অন্ধকার ঘাটে গিয়া নিজেদের নৌকায় উঠিয়া একাকী হাজারখুনীর বিলের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। এমন কি, শ্রীমন্তর অনুরোধও সে এড়াইয়া খালের ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল।

দুই বাড়ীর প্রতিমা পাশাপাশি বিসর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে—বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া প্রতিমার কাঠামো মাটির সঙ্গে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। খাল শূন্য নিরালা পড়িয়া আছে। সুন্দরের প্রাণ ডুকরাইয়া আজ কাঁদিয়া উঠিল—প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য নয়—আজ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই যেন সে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে নিজ পৌরুষ কলঙ্কিনীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে। প্রেম পৌরুষের পাপ্‌ড়িতে ঘা মারিয়া যেমন তাহাকে

জাগাইতে জানে তেমনই আবার ঘা মারিয়া সেই উন্মোচিত পাপ্ড়ি ঝরাইয়া দিতেও পারে। সুন্দর আজ চরম ভাবেই তাই তাহার পরাজয় মানিয়া লইল। বিসর্জ্জনের পালা শেষ হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

টিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে তাহার স্বামী মোহন। টিয়ার ক্রোড়ে টিয়ার দেড় বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র যুবরাজ। যুবরাজ টিয়ার শ্বশুরের দেওয়া নাম—সকলে আদর করিয়া সেই নামেই তাহাকে ডাকে।

শিখীপুচ্ছে পদার্পণ করিয়াই টিয়ার সবকিছু কেমন যেন নূতন লাগিতে লাগিল। বিবাহের পরে এই সে প্রথম বাপের বাড়ী আসিল। বিবাহের পরে সে রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছিল এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাপের বাড়ী আসার সুযোগ তাহার আর হয় নাই। অবশ্য, টিয়ারও শিখীপুচ্ছে আসার জন্য কোন আগ্রহ কোন দিন দেখা দেয় নাই। আর টিয়ার শ্বশুরও টিয়াকে সৎ-মা'র কাছে পাঠাইতে পছন্দ করে না বলিয়াই এতদিন পাঠায় নাই। এবার টিয়ার শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী—সব সদলবলে দেশে আসিযাছে বহু বৎসর পরে এবং এত কাছে আসা সত্বেও টিয়াকে বাপের বাড়ী যাইতে না দিলে খুব খারাপ দেখায় বলিয়াই হয় ত অনুমতি দিয়াছে। শিখীপুচ্ছে প্রবেশ করিয়া টিয়ার কিন্তু মন্দ লাগিতেছিল না। সেই সব পুরাতন পরিচিত স্থান—বহুদিন পরে আবার দেখিতে পাইয়া সে খুশী হইয়া উঠিল।

বাব্লি টিয়ার আগমন-সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিল এবং টিয়া কোন ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাব্লি যুবরাজকে টিয়ার কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া উঠানেই তাহাকে আদর করিতে মাতিয়া উঠিল। যুবরাজ কিন্তু নূতনমানুষ বলিয়া বাব্লির আদরে আপত্তি জানাইল না, হাসিয়া সমস্তই গ্রহণ করিল।

বাব্‌লি টিয়াকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিল, চমৎকার ছেলে হয়েচে কিন্তু তোর। একটু আপত্তি করলে না, একটু কান্না জুড়লে না, বেশ ত চ'লে এলো আমার কোলে। কিন্তু নবদুর্গার মেয়েটা যা হয়েচে—সাধ্য কি কেউ তাকে ছোঁয়। অসম্ভব কান্না জুড়তে পারে বাবা! কি ওর নাম রেখেচিস্ টিয়া শুনি?

টিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, নাম? আমার শ্বশুর ওকে যুবরাজ ব'লেই ডাকেন। আর ও যেন কি একটা নাম রেখেচে, তা আমার মনেই থাকে না।

বাব্‌লি বলিল, বাঃ, যুবরাজ ত চমৎকার নাম, আমরাও ওকে যুবরাজ ব'লেই ডাকব।

বলিয়া বাব্‌লি যুবরাজের গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, কেমন গো যুবরাজ, আপত্তি নেই ত তোমার কিছু?

যুবরাজ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল, যেন সমস্তই সে বুঝিয়াছে এবং বড় রঙ্গের কথাই হইয়াছে।

মোহন ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল নিশি সজ্জনের সঙ্গে। টিয়া কিন্তু উঠানে দাঁড়াইয়া বাব্‌লির সঙ্গে কথা কহিতেই লাগিল। কথার যেন তাহাদের আর শেষ নাই—কত কথাই ত বলিবার আছে। বাব্‌লির বিবাহের কোন সংবাদ টিয়া পায় নাই বলিয়া কত অনুযোগ করিল এবং কোথায় বিবাহ হইয়াছে, কেমন লোক তাহারা, কিরূপ তাহার দিন শ্বশুরালয়ে কাটিয়াছে, ইত্যাদি কত কথাই টিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তারপরে আরও কত গোপন কথা যে জিজ্ঞাস্য আছে তাহার ত অন্ত নাই কিন্তু উঠানে দাড়াইয়া সে সব কথা ত আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, কাজেই টিয়া বলিল, চ বাব্‌লি, ঘাট থেকে মুখ-হাত পা ধু'য়ে আসি—পথের কাপড়-চোপড় ছেড়ে খালাস পাই।

টিয়া স্যুট্‌কেশ্ হইতে কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া বাব্‌লিকে সঙ্গে

করিয়া কলঙ্কিনীর খালের ঘাটে চলিল। যুবরাজ বাব্‌লির কোলেই রহিল। পথে টিয়া যুবরাজকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইল, ইটি তোমার মাথিমা যুবরাজ।

ঘাটের কাছে বাতাবি লেবু গাছটার তলায় আসিয়া দাঁড়াইতেই টিয়ার গা কেমন যেন ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিল। বাতাবি লেবু গাছটায় আজ অসংখ্য ফল ধরিয়াছে। টিয়ার বুকটা কেন জানি কাঁপিয়া উঠিল, মুখের কথা তাহার সহসা বন্ধ হইয়া আসিল।

ওপারের দত্ত-বাড়ীর ঘাটে কে যেন একটি টিয়ারই সমবয়সী বধূ নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বধূটী বিধবা—কিন্তু অপরূপ সুন্দরী বলিয়া টিয়ার মনে হইল। টিয়ার মন কেন জানি খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল। এত রূপ ও এতবড় সর্ব্বনাশ একসঙ্গে সে যেন জীবনে কোথাও দেখে নাই।

বাব্‌লিও বিধবা বধূটিকে দেখিয়া মুহূর্ত্তে টিয়ার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, ঐ যে ঘাটে দাঁড়িয়ে না ঐ হ'ল সুন্দরের স্ত্রী। কি চমৎকার রূপ, কিন্তু···

বাব্‌লি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

টিয়ার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত মহাকালের মহাসর্ব্বনাশের হিমনিশ্বাস যেন বহিয়া গেল। পায়ের তলায় ধরণী যেন টল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল।

ওপারের বধূটির কিন্তু কোনদিকেই হুঁস্‌ ছিল না—অপলক দৃষ্টিতে পাষাণ প্রতিমার মত সে যেন কলঙ্কিনীর খালের জলের দিকে চাহিয়া ছিল। অপর পার হইতে কেহ যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে একবারও খেয়াল করিল না।

বাব্‌লি বলিল, ওরই নাম ইন্দুমতী। এত রূপ বড় একটা দেখা যায় না।

টিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল—ভয়ার্ত্তের আর্ত্তনাদের মতই তাহা শুনাইল।

সজ্জন-বাড়ীর ঘাটের বেড়া তখন আর নাই। টিয়া ঘাটে নামিয়া জলে

নাড়া দিতেই ওপারের বধূটির সম্বিত যেন ফিরিয়া আসিল। সে মুহূর্ত্তে চকিতা ভীতা হরিণীর ন্যায় ঘাট হইতে সরিয়া গেল।

বাব্‌লি বলিল, হয় ত দাঁড়িয়ে সুন্দরের স্বপ্নই ও দেখ্‌ছিল। সুন্দর এই কলঙ্কিনীর খালেই ডুবে মরেচে কি না!

টিয়া কাতর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ব'লিস্ কি বাব্‌লি? কেন, সে কি আত্মহত্যা করেছে নাকি?

বাব্‌লিও বেদনাবিধুর কণ্ঠে বলিল, ও, তুই বুঝি তা'হলে কিছু শুনিস্‌নি? না, আত্মহত্যা করবে কেন। তবে তোরই জন্যে ও মরেচে! সত্যি তোকে ও বড় ভালবেসেছিল! কলঙ্কিনীর জলে যেদিন ওর লাশ ভেসে উঠল—সে যে কি···

টিয়া খালের জলে হাত ডুবাইয়া বাব্‌লির কথা শুনিযা চলিয়াছিল, সভয়ে সে জল হইতে হাত তুলিযা উঠিয়া দাঁড়াইল। কলঙ্কিনীর খালের দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিল না, পাড়ে উঠিয়া আসিল।

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে টিয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া একাকী আবার খালের ঘাটে অকারণে গিযা দাঁড়াইল।

ওবেলার মত এবেলাও ইন্দুমতী ঠিক সেই একই স্থানে একই ভাবে ওপারে দাঁড়াইয়া আছে। টিয়া প্রথম চম্‌কাইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে স্থির দৃষ্টিতে অপরূপা ইন্দুমতীর রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চোখে তাহার জল আসিয়া গেল। এই কলঙ্কিনীর খালের দুই পারের দুই বাড়ীতে কত পুরুষ ধরিয়াই ত শত্রুতার কত নৃশংস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতবড় নৃশংসতা আর কখনও কোনও পুরুষে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া টিয়ার জানা নাই। এমন করিয়া শত্রুকে কেহ কখনও পরাজিত করিয়াছে বলিয়া সে ভাবিতে পারিল না। শত্রুতার চরম প্রতিশোধ যেন এতদিনে লওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকারে শত্রুকে নিঃস্ব রিক্ত নিঃশেষিত করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। এ যেন অভূতপূর্ব্ব নবতম পদ্ধতিতে নিষ্ঠুরতম শত্রুতা সাধিত হইয়াছে। টিয়া আকুল হইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। তাড়াতাড়ি চোখে তাই সে কাপড় চাপা দিয়া দাঁড়াইল।

একসময় টিয়া সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল।···কিন্তু—না, কই—কেহ ত পিটুলি ফল ছুঁড়িয়া তাহার কপালে মারে নাই! হইবে—হয় ত সে স্বপ্নই দেখিতেছিল।

ভাল করিয়া তাই চোখ মুছিয়া সে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু ইন্দুমতী তখন চলিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬